কিশোর ক্লাসিক

গালিভারস্ ট্রাভেলস্

জোনাথন সুইফট্

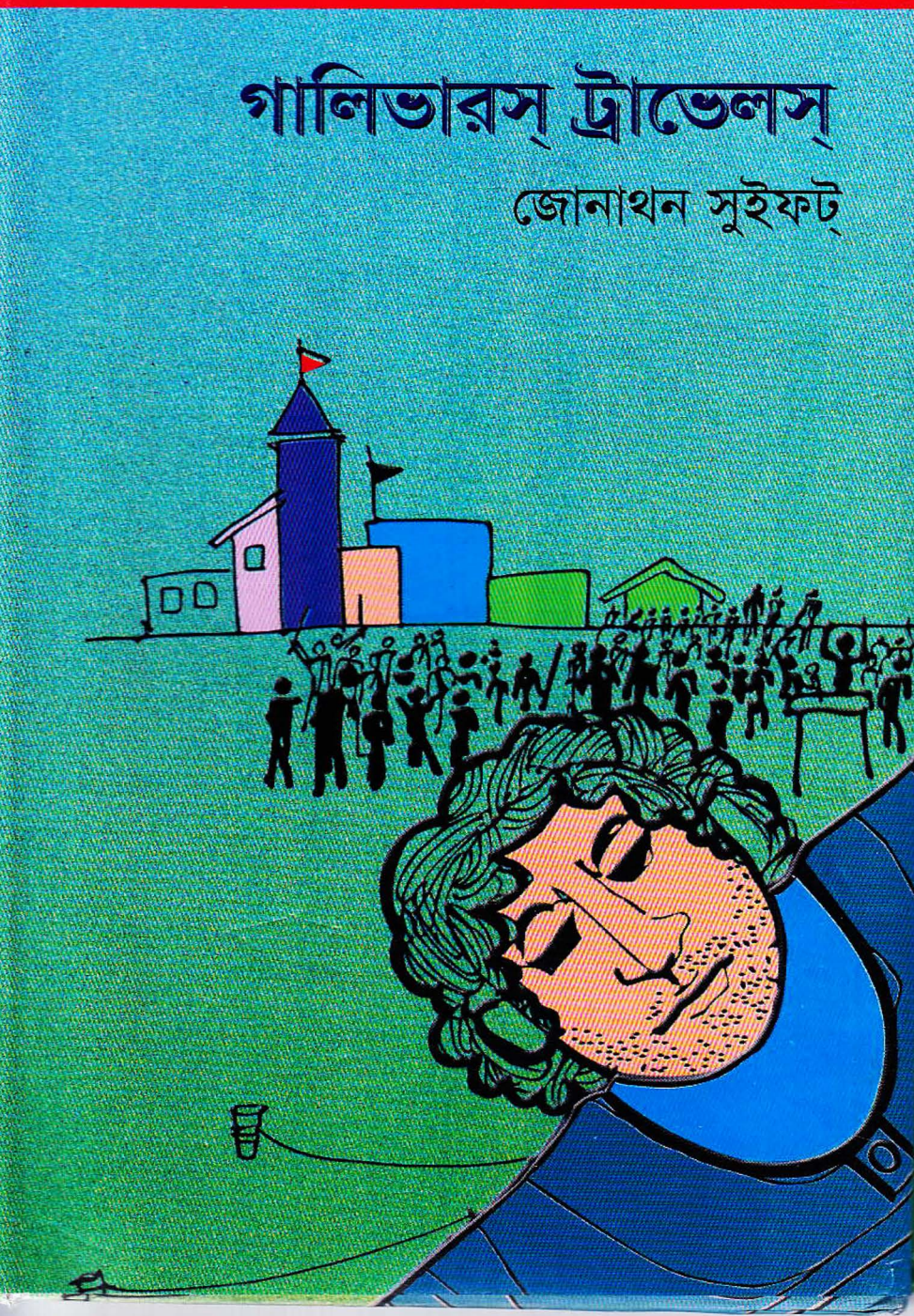

গালিভারস্ ট্রাভেলস্

কিশোর ক্লাসিক

মূল জোনাথন সুইফট্

অনুবাদ ও সম্পাদনা

জাকির হোসেন

নালন্দা

প্রকাশক রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
নালন্দা ৬৯ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রচ্ছদ উত্তম সেন
মুদ্রণ শামীম প্রিন্টিং প্রেস
মূল্য ১৩০.০০ টাকা মাত্র।

Publisher Redwanur Rahman Jewel
Nalonda 69 Paridash Road
Banglabazar Dhaka 1100
First Published February 2004
Sec. Published October 2006
Third Published February 2010
Cover Design Uttam sen
Printing Shamim Printing Press
Price 130.00 Only
ISBN 978-984-8844-30-4
e-mail nalonda_@yahoo.com

ভূমিকা

১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে জোনাথন সুইফট জন্মগ্রহণ করেন। পিতারও নাম জোনাথন সুইফট। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে পুত্র জোনাথন সুইফট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, শুধু জানা যায় যে তাঁর নাম ছিল রেভারেন্ড টমাস। জোনাথন সুইফট ধর্মযাজক ছিলেন কিন্তু ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের সমর্থক ছিলেন বলে তিনি নিপীড়িত হয়ে দেশ ত্যাগ করে আয়ারল্যান্ডে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। আয়ারল্যান্ডে এসে তিনি ইংল্যান্ডের লিস্টার জেলার মেয়ে অ্যাবিগেল এরিককে বিয়ে করেন। স্বামী মারা যাবার পর অ্যাবিগেল খুব দুর্দশায় পড়েছিলেন।

ছোটো জোনাথন সুইফটকে তার ধাইমা ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। সেখানে হোয়াই হ্যাভেন গ্রামে কিছুকাল বসবাস করার পর জোনাথনের বয়স চার বৎসর হলে তার ধাইমা তাকে আবার আয়ারল্যান্ডে ফিরিয়ে এনে তার চাচা গডউইন সুইফটের জিম্মা করে দেয়। জোনাথনকে চাচা কিলকেনিতে স্কুলে পড়তে পাঠান। চৌদ্দ বছর বয়সে জোনাথন ডাবলিনে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিনই তাঁর সুনাম ছিল না। ১৬৮৫ সালে বিশেষ গ্রেস নম্বর পেয়ে তিনি কোনোরকমে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৬৮৮ পর্যন্ত জোনাথন ট্রিনিটি কলেজে ছিলেন তারপর লিস্টারে গিয়ে মায়ের সঙ্গে কিছুদিন (১৬৮৯) বাস করেছিলেন। তারপর ফার্নহ্যামের কাছে খুর পার্কে স্যার উইলিয়ম টেম্পল নামে কূটনীতিকের সেক্রেটারির চাকরি পান। ভদ্রলোকের সাহিত্যিক হিসাবে কিছু খ্যাতি ছিল। মাঝে দু'বার বিরতি ব্যতীত (১৬৯০—৯১) আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিলেন 'হোলি অর্ডার' গ্রহণ করতে এবং ১৬৯৪-৯৫ সালে প্রায় পনের মাস বেলফাস্টের কাছে কিলরুট এ ছিলেন। তিনি ১৬৯৯ পর্যন্ত খুর পার্কে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মিঃ টেম্পলের দক্ষিণ হস্ত রূপে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন।

কর্মসূত্রে তাঁকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হত (ফলে কলেজে শিক্ষার ঘাটতি পূরণ হয়ে গিয়েছিল) এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে (রাজা তৃতীয় উইলিয়ম অন্যতম) আসতে হয়েছিল যার ফলে তিনি রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এই খুব পার্কেই তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল এসথার জনসনের সঙ্গে—বলা হয় ইনি নাকি স্যার উইলিয়ম টেম্পলের অবৈধ কন্যা—যিনি তাঁর জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে ছিলেন। এসথারই হল সুইফট-এর ''জর্নাল'-এর স্টেলা। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের সময় এসথারের বয়স ছিল আট বছর এবং সুইফট এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল শিক্ষক ও ছাত্রীর।

কাব্যরচনা নিয়ে সুইফট-এর সাহিত্যজীবন শুরু এবং গোড়ার দিকের তিনটি দীর্ঘ রচনা তাঁর কাব্য সংকলনে স্থান পেয়েছে। গালিভারস ট্র্যাভেলস বাদ দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক রচনা 'এ টেল অফ এ টাব' ১৬৯৭-৯৯ সালে লেখেন। এই সময়েই তিনি আরো দুটি ছোটো রচনা 'ব্যাটল অফ দি বুকস' এবং 'মেকানিক্যাল অপারেশন অফ দি স্পিরিট' লেখেন। এই তিনটি বই একত্রে ১৭০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬৯৯ সালে স্যার টেম্পল মারা যান। সুইফটের নামে কিছু সম্পত্তি এবং তাঁর স্মৃতিকথা 'মেময়ারস' বিক্রির লভ্যাংশও উইল করে যান। ঐ বছরেই হেমন্তকালে সুইফট আয়ারল্যান্ডের অন্যতম লর্ড জাস্টিস আর্ল অফ বার্কলের পারিবারিক পাদ্রী নিযুক্ত হন। তাঁরই আনুকূল্যে যথাসময়ে ডাবলিনের কাছে লারাকর গ্রামবাসীদের এবং সেন্ট প্যাট্রিকস ক্যাথিড্রাল থেকে সুইফট খ্রিস্টিয় ধর্ম পালন বাবদ নিয়মিত উপস্বত্ত্বের অধিকারী হন। প্রথমে তিনি 'ডাবলিন ক্যাসল'-এ যেয়ে বাস করতে থাকেন এবং পরে লারাকর গ্রামের ধর্মযাজকের জন্যে নির্দিষ্ট বাসায় উঠে যান এবং সেখানে তিনি কিছুকাল সাধারণ পাদ্রী হিসাবে বাস করেন। তিনি প্রায়ই ডাবলিন যেতেন এবং ওখান থেকে তিনি ডক্টর অফ ডিভিনিটি ডিগ্রি লাভ করেন এবং অচিরে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন।

১৭০১ সালে এসথার জনসনের (স্টেলা) বয়স যখন কুড়ি তখন সে এবং তাঁর বান্ধবী রেবেকা ডিংলে লারাকরের কাছে বাস করতে আসেন এবং এই সময় থেকে সুইফট ও 'স্টেলা'র মধ্যে এমন একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা তাঁরা অব্যাহত রেখেছিলেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সুইফট একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশ্য এই অনিচ্ছুকতার সমর্থনে সুইফটের যুক্তি থাকলেও তার মানসিক গঠনও ছিল বিবাহের বিরুদ্ধে। সুইফট নানারকম মানসিক বৈকল্যতে ভুগতেন তাঁর উপর সাময়িক বধিরতা, মাথাঘোরা এবং বমনেচ্ছায় ভুগতেন, বর্তমানে যে রোগকে মেনিয়ারাস ডিজিজ বলা হয় সেই রোগ আর কি।

১৭০১ থেকে ১৭০৪-এর মধ্যে সুইফট কয়েকবার লিস্টার এবং লন্ডনে গিয়েছিলেন এবং এ্যাডিসন, পোপ ও স্টিল-এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। তাঁর লন্ডন পর্যায় (লন্ডন পিরিয়ড) আরম্ভ হয় ১৭০৭ সালে। এই বছর সরকারি চার্চ মিশনে তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠান হয়েছিল। তিনি তাঁর অভীষ্ট কাজ শেষ করেন নি। যা হোক তাঁর অনেক বন্ধু জুটেছিল এবং রসিক ব্যক্তি ও 'এটেল অফ এ টাব' গ্রন্থের রচয়িতা রূপে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। লন্ডনে বাস করবার সময় তিনি চার্চ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে কয়েকখানি পুস্তিকা এবং লন্ডন-জীবন নিয়ে কয়েকটি কবিতা লেখেন যেগুলো 'ট্যাটলার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।'১৭০৯ সালে তিনি আয়ারল্যান্ডে ফিরে আসেন কিন্তু পরের বছরেই হেমন্তে তাঁকে আবার লন্ডনে ফেরত পাঠান হয়। এই দ্বিতীয়বার লন্ডনে থাকবার সময় তিনি প্রবল রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েন এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথমে তিনি ছিলেন 'হুইগ' দলে পরে 'টোরি' দলে চলে গিয়ে 'একজামিনার' পত্রিকায় (ভাইকাউন্ট বলিংব্রুক প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রিকা) প্রবন্ধ এবং কয়েকটি পুস্তিকা যথা 'দি কন্ডাক্ট অফ দি অ্যালিজ' (১৭১১) এবং 'দি পাবলিক স্পিরিট অফ দি হুইগম' মারফত টোরিদলকে আক্রমণ করতে থাকেন। প্রথমোক্ত পুস্তিকাটি রাজনৈতিক প্রচার কৌশলের মধ্যে সর্বকালের তীক্ষ্ণতম পুস্তিকা হিসেবে স্বীকৃত। জনমতের উপর পুস্তিকাটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে ফলে স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ থেকে ইংল্যান্ড সরে আসে এবং ১৭১৩ সালে ইট্রেক্ট শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

খ্রিস্টান ধর্ম সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সরকারের অনুকূলে প্রচুর কাজ করা সত্ত্বেও সুইফট কিন্তু ইংল্যান্ডের ডীন পদবী এমন কি বিশপের মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি যদিও তা পাওয়া তাঁর পক্ষে উচিত ছিল। যা হোক ১৭১৩ সালে তাঁকে কিছু স্বীকৃতি দেওয়া হয়, লর্ড অক্সফোর্ডের চেষ্টায় তাঁকে ডাবলিনের সেন্ট প্যাট্রিকস চার্চের ডীন-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। পরের বছর কুইন অ্যান-এর মৃত্যু হয় এবং হুইগ_দল মন্ত্রীত্ব গঠন

করে। এর অর্থ লন্ডনে সুইফটের রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান এবং সেই সঙ্গে তাঁর সকল আশা আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু। ইংল্যান্ড ছিল তাঁর আধ্যাত্ম ও চিন্তা শক্তি বিকাশের বাসভূমি আর আয়ারল্যান্ডে ফিরে আসা মানে নির্বাসনে যাওয়া।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সুইফট এসথার জনসনকে পরপর অনেক চিঠি লিখেছিলেন অধিকাংশই দিনলিপি হিসেবে। এই চিঠি লেখার কাল ছিল ১৭১০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৭১৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত। এই চিঠিগুলো বই আকারে 'জর্নাল টু স্টেলা' নামে প্রকাশিত হয়ে রসিক সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছিল। ইংল্যান্ডে থাকবার সময় সুইফট আর একটি যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তারও প্রথম নাম এসথার, এসথার ভ্যানোম্রাই (ভ্যানেসা)। এই যুবতীটিকেও সুইফট অনেক চিঠি লিখেছিল এবং 'ক্যাডিনাম অ্যান্ড ভ্যানেসা' নামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন। 'ভ্যানেসা' প্রবলভাবে সুইফটের প্রেমে পড়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে আয়ারল্যান্ডেও গিয়েছিল। 'স্টেলা' এবং 'ভ্যানেসা' ডাবলিনে বা কাছেই বাস করত কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্ব জানত না। এই দুই মহিলার সঙ্গে সুইফটের সম্পর্ক সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা প্রগাঢ় ছিল তবু সুইফট নাকি একে প্রেম বলতেন না। সুইফট সম্ভবত 'স্টেলা'কে গোপনে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে কখনো একত্রে বাস করেন নি। ১৭২৩ সালে 'ভ্যানেসা' মারা যায় আর 'স্টেলা' পাঁচ বছর পরে।

সেন্ট প্যাট্রিকের ডীন হিসেবে এবং কয়েকজন বন্ধু পরিবৃত হয়ে সুইফট তাঁর অবসর জীবন যাপন করতেন। আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে সুইফট তাঁর প্রচুর ক্ষমতা ব্যয় করেছিলেন যার ফলে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর লিখিত "ড্রেপিয়ারস লেটার" আয়ারল্যান্ডে 'উডস হাফ পেন্স'-এর প্রচলন বন্ধ করেছিল যার জন্যে তিনি জাতীয় বীরের সম্মান অর্জন করেছিলেন। এরপর থেকে আইরিশদের কাছে তিনি শুধুই 'দি ডীন' নামে পরিচিত হতেন।

'গালিভারস ট্র্যাভেলস' প্রকাশের জন্যে তিনি ১৭২৬ সালে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন যা তিনি পাঁচ বছর আগে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এই একমাত্র বই যা লিখে তিনি প্রকাশকের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছিলেন (২০০ পাউন্ড)। বই প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাফল্য। ১৭২৭ সালে তিনি আবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। পোপের কাছে থাকতেন, আগেও তাই থাকতেন। পরের বছরে স্টেলা মারা যায়।

এরপর কয়েক বছর সুইফটের জীবন অপরিবর্তিতভাবে চলতে থাকে। অনেক কবিতা লিখতেন এবং চার্চ ও আইরিশ সমস্যা নিয়ে প্রচারপত্রও লিখতেন। ইংল্যান্ডে বন্ধুদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন এবং তাদের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া আসাও করতেন। ক্রমশ দৈহিক পীড়ায় তিনি জর্জরিত হয়ে পড়েন ফলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, অসামাজিক হয়ে পড়েন, অদ্ভুত সব চিন্তা করতেন এবং মাঝে মাঝে দপ করে রেগে উঠতেন। তাঁর ভয় ছিল তিনি বুঝি উন্মাদ হয়ে যাবেন এবং তাই হয়েছিলেন, তবে তখন তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছিল।

১৭৪৫ সালের ১ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্রালে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। কবরের ।রে স্মৃতিস্তম্ভে যে কথাগুলো উৎকীর্ণ আছে তা তিনি নিজেই লিখে রেখে গিয়েছিলেন

এইচ ডি আর

প্রথম ভাগ
লিলিপুটদের দেশে

প্রথম পরিচ্ছেদ

[লেখক তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের কিছু ইতিহাস দিচ্ছেন। ভ্রমণে তাঁর প্রথম আগ্রহ। জাহাজ ডুবি হল, প্রাণ বাঁচাতে সাঁতার কাটতে হল, নিরাপদ তীরে পৌঁছলেন কিন্তু দেশটা হল লিলিপুটদের। বন্দী হলেন, লিলিপুটরা তাদের দেশে লেখখকে নিয়ে গেল।]

নটিংহ্যামশায়ারে আমার বাবার ছোটো একটা জমিদারী ছিল, আমি হলাম বাবার পাঁচ ছেলের মধ্যে তৃতীয়। আমার বয়স যখন চৌদ্দ তখন বাবা আমাকে কেমব্রিজে এমানুয়েল কলেজে পাঠালেন। সেখানে আমি তিন বছর ছিলাম এবং বেশ মন দিয়েই লেখাপড়া করছিলাম। কিন্তু কলেজে পড়ার আমার যে খরচ (যদিও আমার জন্যে বরাদ্দ অর্থ যৎসামান্যই ছিল) বাবার আয়ের তুলনায় বেশি ছিল। অতএব আমার পড়া বন্ধ হল এবং আমাকে সাধ্য হয়েই লন্ডনের বিখ্যাত সার্জন মিঃ জেমস বেটসের কাছে শিক্ষানবিশির কাজ নিতে হল। মিঃ বেটসের কাছে আমি চার বছর ছিলাম। বাবা আমাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাতেন। আমি সেই টাকায় জাহাজ চালানের বিদ্যা এবং দেশ ভ্রমণে কাজে লাগতে পারে গণিতের সেই সব তথ্য শিখতে লাগলাম কেননা আমি বিশ্বাস করতাম যে সমুদ্রযাত্রায় কোনো না কোনো সময়ে আমার ভাগ্য ফিরবে। মিঃ বেটসের কাজ ছেড়ে আমি বাবার কাছে ফিরে এলাম। বাবা এবং জন কাকা এবং কয়েকজন আত্মীয়ের কাছ থেকে আমি চল্লিশ পাউন্ড সংগ্রহ করলাম আর বছরে তিরিশ পাউন্ডের প্রতিশ্রুতি পেলাম। আমার উদ্দেশ্য আমি লাইডেন যাব। সেখানে আমার খরচ চালাতে হবে। লাইডেনে দু বছর সাত মাস ধরে আমি ফিজিক্স পড়লাম, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় এ বিদ্যা.খুবই প্রয়োজনীয়।

লাইডেন থেকে ফিরে আসার পর আমার কল্যাণকামী মনিব মিঃ বেটস আমাকে ক্যাপটেন আব্রাহাম প্যানেলের কাছে পাঠালেন। তিনি 'সোয়ালো' জাহাজের কমান্ডার। জাহাজের সার্জন পদটি খালি ছিল। মিঃ বেটস অনুমোদন করায় আমি চাকরিটি পেলাম। ঐ জাহাজে আমি ছিলাম সাড়ে তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে লেভান্ট এবং আরো কয়েকটি বন্দরে বা দেশে যাওয়া-আসা করলাম। দেশে ফিরে স্থির করলাম লন্ডনে বসবাস করব। আমার মনিব মিঃ বেটস আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁর মারফত আমি কয়েকজন রোগীও পেলাম। ওল্ড জুরি পাড়ায় একটা বাড়ির অংশ ভাড়া নিলাম এবং বন্ধুদের পরামর্শে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে আমি নিউ গেট স্ট্রিটের হোসিয়ারী ব্যবসায়ী মিঃ এডমন্ড বার্টসের মেজ মেয়ে মিস মেরি বার্টনকে বিয়ে করে যৌতুক স্বরূপ চারশ পাউন্ড পেলাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমার সেই কল্যাণকামী মনিব মিঃ বেটস দু বছর পরে মারা গেলেন। আমার পরিচিত সংখ্যা বেশি না থাকায় আমার ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ

করল। তাছাড়া আমার সমব্যবসায়ীদের কুনীতি অনুসরণ করতে আমার বিবেকে বাধল। অতএব আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এবং কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার সমুদ্রযাত্রায় যাওয়াই স্থির করলাম। আমি পরপর দুটো জাহাজে সার্জন ছিলাম এবং ছ-বছর ধরে ইস্ট এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ কয়েকবার সমুদ্রযাত্রার ফলে কিছু অর্থ সঞ্চয় করলাম। অবসর সময়ে আমি প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের ভালো ভালো বই পড়তাম। বইয়ের কোনো অভাব ছিল না তাছাড়া আমি যখনি কোনো দেশে অবতরণ করতাম তখনি আমি সেই দেশের ভাষা ও মানুষের আচার ব্যবহার রীতিনীতি আয়ত্ত করতাম। আমার স্মরণশক্তি প্রখর থাকায় এসব শিখতে আমায় বেগ পেতে হয় নি।

শেষ সমুদ্রযাত্রাটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যজনক হয় নি। আমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, সমুদ্র যেন আর ভালো লাগে না; তাই আমি ঠিক করলাম স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে এবার বাড়িতেই থাকা যাক। ওল্ড জুরি পাড়া থেকে আমি ফেটার লেনে উঠে গেলাম এবং সেখান থেকে ওয়াপিং পল্লী, আশা যে এখানে নাবিকদের মধ্যে আমার পেশা ভালো জমবে। কিন্তু তা হবার নয়। তিন বছর অপেক্ষা করলাম কিন্তু বরাত ফিরল না। তখন ভাগ্যক্রমে একটা চাকরি জুটে গেল। ক্যাপটেন উইলিয়ম রিচার্ড তাঁর 'অ্যান্টিলোপ' জাহাজ নিয়ে সাউথ সি যাচ্ছেন। ১৬৯৯ সালের ৪ঠা মে আমরা ব্রিস্টল থেকে যাত্রা করলাম এবং গোড়ার দিকে তরতরিয়ে এগিয়ে চললাম

এই সব সমুদ্রে আমাদের সমুদ্র অভিযানের বিবরণী দিয়ে পাঠকদের পীড়িত করা ঠিক হবে না। তবে এইটুকু বলে রাখা ভালো যে ইস্ট ইন্ডিজ পার হবার পর আমরা প্রবল ঝড়ের টানে ভ্যান ডাইমেন আইল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম দিকে ভেসে গেলাম। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে আমরা ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশ অতিক্রম করে দক্ষিণে খানিকটা চলে এসেছি। কঠোর পরিশ্রম আর খারাপ খাদ্য আমাদের বারজন নাবিকের মৃত্যুর কারণ হল আর বাকিরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। নভেম্বরে এখানে গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়। পাঁচ তারিখে আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের একজন নাবিক জাহাজ থেকে মাত্র আট কেবল মানে তিন শ ফুট আন্দাজ দূরে একটা পাহাড় দেখতে পেল। কিন্তু বাতাস এত প্রবল বেগে বইছিল যে পাহাড়টা কিছুতেই এড়ানো গেল না, জাহাজ সজোরে সেই পাহাড়ে ধাক্কা মারল। আমি এবং আরো পাঁচজন নাবিক সমুদ্রে একটা নৌকো নামাতে পেরেছিলাম তাই কোনোরকমে একটা বাতাস এসে আমাদের নৌকোটাকে ধাক্কা দিয়ে সব এলোমেলো করে দিল। আমার নৌকোর সঙ্গীদের কী হল কিংবা যারা পাহাড়টার উপর পালাতে পেরেছিল কিংবা যারা জাহাজে থেকে গিয়েছিল, এদের সকলের ভাগ্যে কি ঘটেছিল আমি কিছুই জানি না, তবে আমার বিশ্বাস তারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার ভাগ্য অন্যরকম যে জন্যে আমি সাঁতার কেটে বা বাতাস ও জোয়ারের ধাক্কায় এগিয়ে যেতে পারছিলাম। মাঝে মাঝে আমি পানিতে পা ডুবিয়ে পানির গভীরতা জানবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তল পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, হাত পা আর চলছে না তখনি আমি পায়ের নিচে জমি পেলাম, ইতোমধ্যে ঝড়ও বেশ কমে গেছে। সাগরের গভীরতা কম এখানে। প্রায় মাইল খানেক হেঁটে ডাঙায় উঠলাম। আমার মনে হল এখন সন্ধ্যা আটটা হবে। ডাঙায় উঠে আধ মাইলখানেক হাঁটলাম কিন্তু কোনো বাড়ি বা বাসিন্দা চোখে পড়ল না, তবে আমি এতই দুর্বল হয়ে

পড়েছিলাম যে সেগুলো আমার নজরেই পড়ে নি। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর বেশ গরম মনে হচ্ছিল, জাহাজ ছাড়ার আগে আধ পাঁইট ব্র্যান্ডিও খেয়েছিলাম, এইসব কারণে ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছিল। আমি ছোটো ছোটো ও নরম ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। এত গভীর ভাবে আমি কখনো ঘুমাই নি। মনে হয় আমি ন ঘণ্টারও বেশি ঘুমিয়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। আমি উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু একি? আমি নড়তে পারছি না কেন? কারণটা বুঝলাম। আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। আমার দুই হাত ও দুই পা আর আমার মাথার লম্বা চুল কেউ বা কারা জমির সঙ্গে বেশ মজবুত করে বেঁধে দিয়েছে। আমার বুক ও উরুর উপর দিয়েও বেড় দেওয়া হয়েছে। পাশ ফিরতে পারছিলাম না তাই উপর দিকেই চেয়েছিলাম। রোদ ক্রমশ গরম হচ্ছে, আলো চোখকে পীড়া দিচ্ছে। আমাকে নিয়ে কারা বুঝি কিছু বলাবলি করছে কিন্তু আমি যে ভাবে শুয়ে আছি তাতে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটু পরেই আমার মনে হল আমার বাঁ পায়ের উপর কিছু একটা জীবন্ত প্রাণী চলে বেড়াচ্ছে এবং সেটা আস্তে আস্তে আমার বুকে এসে উঠল এবং প্রায় আমার চিবুকের সামনে এসে থামল। যতটা পারি চোখ নামিয়ে আমি দেখলাম সেটা মনুষ্যাকার একটা প্রাণী, বড়জোর ছ ইঞ্চি লম্বা, হাতে তীর, ধনুক, পিঠে তীর রাখবার তূণীর। ইতোমধ্যে আমি দেখলাম প্রথম ক্ষুদে মানুষটিকে অনুসরণ করে আরো চল্লিশজন (আমার তাই মনে হল) এগিয়ে আসছে। আমি তো ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এবং এত জোরে চিৎকার করে উঠলাম যে ওরা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করল। পরে শুনছিলাম যে আমার দেহ থেকে নিচে লাফাতে গিয়ে কয়েকজন আহত হয়েছিল। যাহোক একটু পরে তারা আবার ফিরে এল এবং আমার পুরো মুখখানা দেখবার জন্যে একজন সাহস করে এগিয়ে এল। সে প্রশংসার ভঙ্গিতে দু হাত ও চোখ তুলে পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল 'হেকিনা দেগুল'। তার সঙ্গীরাও শব্দ দুটি সমস্বরে কয়েকবার উচ্চারণ করল কিন্তু তার যে কী অর্থ তা আমি জানি না। কী তারা বলতে চাইছে? পাঠকরা বুঝতেই পারছেন আমি বেশ অস্বস্তিতেই সারাক্ষণ শুয়ে আছি। অবশেষে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় আমি বলপ্রয়োগ করলাম ফলে যেসব গোঁজের সঙ্গে সরু দড়ি দিয়ে ওরা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল সেগুলো মাটি থেকে পটাপট উঠে গেল। দড়িও ছিঁড়ল। বাঁ হাতটা আগে মুক্ত করলাম। এবার বুঝলাম ওরা আমাকে কী ভাবে বেঁধেছে কিন্তু মাথা তুলতে পারছি না, বাঁ দিকের চুলগুলো কোথাও আটকাচ্ছে তবুও জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলাম, বেশ আঘাত লাগল কিন্তু উপায় কী? যা হোক মাথাটা এখন ইঞ্চি দুয়েক ঘোরাতে পারলাম। তাদের একটাকেও ধরবার আগেই তারা আবার পালিয়ে গেল এবং এবারও আগের মতো সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার থামবার পর শুনলাম একজন জোরে বলছে 'তোলগো ফেনাক'। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম আমার বাঁ হাতের ওপরের দিকে শখানেক তীর এসে বিঁধল। মনে হল যেন শত শত সুচ ফুটল। তারপর আমরা ইউরোপে যেমন বোমা ছুঁড়ি ওরাও সেইরকম আকাশের দিকে কিছু ছুঁড়ল এবং তা ফেটে আমার উপর কিছু অংশ পড়তে লাগল কিন্তু যা পড়ল তা এতই হালকা যে আমি কিছুই অনুভব করলাম না। তীর বৃষ্টি শেষ হল, আমি ব্যথা অনুভব করছি, বাঁধন খোলবার চেষ্টা করছি। এমন সময় প্রথমবার অপেক্ষা আরো বেশি পরিমাণ একঝাঁক তীর এসে আমাকে বিঁধল।

এ তীরগুলো আগের চেয়ে বড়। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র বর্শাহাতে আমাকে আক্রমণ করল, ভাগ্যক্রমে আমার গায়ে ছিল পুরু রাফ্ জার্কিন যা ঐ বর্শাগুলো ভেদ করতে পারল না। আমি ভাবলাম এখন চুপচাপ পড়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাত্রি পর্যন্তই এইভাবে থাকব। বাঁ হাতটাও আলগা হয়েছে অতএব নিজেকে সহজে মুক্ত করতে পারব। আর তারপর এই সব বাসিন্দারা, এরা সবাই যদি এমন ক্ষুদে হয় এবং আরো বড় দল নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে তাহলেও আমি এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারব। কিন্তু আমার ভাগ্যে অন্যরকম লেখা ছিল। বাসিন্দারা যখন দেখল আমি চুপচাপ পড়ে আছি তখন তারাও তীর ছোড়া বন্ধ করল। কিন্তু কোলাহল বাড়ছে, তাহলে ভিড়ও বাড়ছে। আমার ডান কান থেকে চার গজ দূরে দুমদাম, আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঘণ্টাখানেক এই আওয়াজ চলল, লোকজন কাজ করছে। বাঁধন থাকা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ঘাড় ফেরালাম, কী হচ্ছে দেখা দরকার। আমি দেখলাম, জমি থেকে ফুট খানেক উঁচু একটা মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। মঞ্চে জনা চার মানুষের জায়গা হতে পারবে, মঞ্চে উঠবার জন্যে দুটো তিনটে মইও লাগানো হচ্ছে। মঞ্চে একজন উঠলেন, দেখে মনে হল কেউকেটা, তিনি আমাকে উদ্দেশ করে একটা বক্তৃতা দিলেন যার একবর্ণও আমি বুঝলাম না। আমার বলা উচিত যে সেই কেউকেটা ভদ্রলোক তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করবার পূর্বে তিনবার 'লাংরো দেহুল সান' শব্দগুলো চিৎকার করে বললেন (শব্দ তিনটির অর্থ আমাকে পরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। বলার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশজন বাসিন্দা এসে আমার মাথার ও বাঁদিকের বাঁধন কেটে দিল। ফলে আমি ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে সেই বক্তাকে দেখতে পেলাম। দেখে মনে হল মানুষটি আধাবয়সী এবং তার সঙ্গে যে তিনজন মানুষ রয়েছে তাদের চেয়েও লম্বা। তিনজনের মধ্যে একজন তার বালক-ভৃত্য বা 'পেজ'; বক্তার লম্বা কোটের পিছন দিকটা ধরে আছে। ছেলেটা আমার মাঝের আঙুলের চেয়ে একটু লম্বা হবে, আর বাকি দুজন বক্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তার রক্ষাকারী। বক্তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই সুপরিস্ফুট, কখনো নরম কখনো গরম কখনো সাশানি আবার কখনো অনুরোধ। ভাষা না বুঝলেও কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি শুনে ও দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং অল্প কথায় জবাব দিলাম। সূর্যের দিকে চেয়ে যেন সূর্যকে সাক্ষী রেখে, বাঁ হাত তুলে এবং ডান হাত দিয়ে বার বার আমার মুখ দেখাতে দেখাতে সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমি তাঁকে বোঝাতে চাইলাম যে আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর। সেই জাহাজ ছাড়ার পর থেকে আমার পেটে একটাও দানা পড়ে নি, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। 'হুরগো' (সর্বোচ্চ নেতাকে ওরা এই বলে সম্বোধন করে, এসব অবশ্য পরে জেনেছিলাম) আমার মনোভাব বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলেন। তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এসে আদেশ করলেন আমার দুদিকে মই খাড়া করা হোক। মই খাড়া হতেই কয়েক শত ক্ষুদ্র মানুষ বা বামন মই বেয়ে উঠতে লাগল, টুকরি ভর্তি মাংস নিয়ে আমার মুখের দিকে এগিয়ে এল। সেই সর্বোচ্চ নেতা অর্থাৎ রাজা নাকি আমার বিষয় জানতে পেরেই আমার আহারের আয়োজন করেছিলেন। এখন সেই আহার তিনি আমার কাছে পাঠাবার আদেশ দিয়েছেন। খেতে খেতে বুঝতে পারলাম যে বিভিন্ন কয়েক প্রকার প্রাণীর মাংস আমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্বাদ গ্রহণ করে তাদের চিনতে পারলাম না। মাংসের টুকরোগুলো মটনের টুকরোর মতো গর্দান, রান ইত্যাদি

চেনা যাচ্ছিল কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র। আমি তো একসঙ্গে দুটো তিনটে মুখে পুরছিলাম। আর পাউরুটি? সেগুলো আমার বন্দুকের বুলেটের চেয়েও ছোটো, তাও একসঙ্গে তিনটে করে গালে পুরছিলাম। যত তাড়াতাড়ি পারছিল তারা আমার খাবার জুগিয়ে যাচ্ছিল এবং এত দ্রুত সব সাফ হয়ে যেতে তারাও অবাক হয়ে যাচ্ছিল, চোখ বড় বড় করে দেখছিল। হয়তো ভাবছিল কোথা থেকে একটা রাক্ষস এল। আমার ক্ষিধেও পেয়েছিল ভীষণ। তারপর আমি ইশারা করলাম যে আমার কিছু পানীয় চাই। আমার খাওয়ার বহর দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছিল কী পরিমাণ পানীয় আমার লাগবে। ক্ষুদে হলেও ওদের ছোট্ট মাথায় বুদ্ধি আছে। ওরা ওদের সবচেয়ে বড় পিপে এনে কায়দা করে আমার মুখের কাছে ধরল। আমি তা এক চুমুকেই শেষ করলাম। কতটুকুই বা আর হবে, বড়জোড় হাফ পাঁইট। বেশ সুস্বাদু অনেকটা বার্গান্ডির মতো। ওরা আরো এক পিপে নিয়ে এল, তাও শেষ করে আবার আনতে বললাম। কিন্তু ওদের আর মজুদ নেই, ভাঁড়ার শেষ। ওরা আমার কাণ্ড-কারখানা দেখে আনন্দে উল্লসিত। আমার বুকের উপর উঠে নৃত্য আরম্ভ করে দিল এবং আগের মতো 'হেকিনা দেগুল' ধ্বনি দিতে থাকল। ওরা এবার আমাকে ইশারা করে বলল পিপে দুটি ফেলে দিতে। সেই সঙ্গে তারা জনতাকে সতর্ক করে দিল, সরে যাও, সরে যাও। 'বোরাচ মিভোলা' বলে তারা চিৎকার করতে লাগল। জনতা সরে গেল। আমি পিপে দুটোকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলাম, তাদের তাই না দেখে সে কী উল্লাস। আবার তারা 'হেকিনা দেগুল' ধ্বনি দিতে থাকল। আমার দেহের উপর দিয়ে যখন বামনরা দলে দলে ছোটাছুটি করছিল তখন আমার ভারী লোভ হচ্ছিল যে গোটা পঞ্চাশ বামনকে ধরে মাটিতে আছাড় মারি। তবে ওরা আমাকে কিছু আঘাত করলেও আমার তো কোনো ক্ষতি হয় নি। তাছাড়া ওদেরও আমি ইঙ্গিতে জানিয়েছি ক্ষতি করার ইচ্ছে আমারও নেই এবং তাদের আমি সম্মান করি। অতএব আমি আমার কুচিন্তা মন থেকে দূর করলাম। তাছাড়া আতিথ্যর মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। ওরা ইতোমধ্যেই আমার জন্যে প্রচুর ব্যয় করেছে, যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছে। এই ক্ষুদে মানবগুলোর নির্ভীকতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমার ডান হাত মুক্ত ছিল, ইচ্ছে করলে ওদের প্রচণ্ড আঘাত করতে পারতাম তথাপি ওরা আমাকে দানবসদৃশ জেনেও নির্ভয়ে আমার দেহের উপর হেঁটে চলে বেড়িয়েছে। কিছুক্ষণ পরে যখন তারা বুঝল যে আমি আর মাংস খেতে চাইছি না তখন আমার কাছে মহামান্য সম্রাট প্রেরিত একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এলেন, তিনি আমার ডান পায়ের দিকে থেকে উঠে আমার দেহের উপর দিয়ে বরাবর হেঁটে আমার মুখের কাছে এলেন, সঙ্গে অবশ্য বারজন অনুচর। তারপর তিনি সীলমোহরাঙ্কিত একটি পরিচয়পত্র আমার চোখের সামনে আন্দোলিত করতে করতে এবং কোনো রকম রাগ প্রকাশ না করে প্রায় দশ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিলেন। ভাষা না বুঝলেও এবং কোনো ঝাঁজ না থাকলেও তিনি যা বললেন বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন এবং কথা বলার সময় মাঝে মাঝে সামনের দিকে আঙুল দেখাতে লাগলেন। যেদিকে আঙুল দেখাচ্ছিলেন পরে জেনেছিলাম সেদিকে আছে রাজধানী, প্রায় আধ মাইল দূরে। সপারিষদ সম্রাটের ইচ্ছা যে রাজধানীতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর কথা শেষ হতে আমি উত্তরে কিছু বললাম। অবশ্য আমার ভাষা তাঁরা বুঝলেন না, তারপর আমি সাবধানে আমার মুক্ত বাঁ হাত তুললাম যাতে নাকি সেই রাজকর্মচারী ও তাঁর

অনুচরদের দেহে আঘাত না লাগে এবং আমার শরীরের বন্ধন দেখিয়ে ইশারায় বোঝালাম যে আমাকে বন্ধন মুক্ত করা হোক। তাঁর পরবর্তী ভঙ্গি দেখে বুঝলাম যে তিনি আমার কথা বুঝেছেন কিন্তু ঘাড় নেড়ে জানালেন আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। আমাকে বন্দী করেই রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপরে আমাকে ইশারায় জানালেন যে আমাকে যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হবে এবং ভালো ব্যবহারও করা হবে। বন্দী করা হবে? ভালো লাগল না। ভাবলাম বাঁধন ছিঁড়ে ফেলি কিন্তু তখনি মনে পড়ল ক্ষুদে বামনদের সুচের মতো ধারাল তীর তখনো আমার মুখে ও অন্যত্র বেশ কয়েকটা বিঁধে রয়েছে, যেখানে বিঁধেছিল সে জায়গাগুলো তখনো জ্বালা করছে। এখন ওরা দলে আরো ভারী, আমি বাঁধন ছিঁড়তে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ হবে। তখন আমি ইশারা করে জানালাম ওরা আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সৌজন্যে প্রকাশ করে এবং হাসিমুখে অনুচরসহ 'হুরগো' নেমে গেল। একটু পরেই আমি খুব গোলমাল শুনলাম এবং একটা কথা 'পেপলম সেলান' বারবার শোনা যেতে লাগল। আমার বাঁ দিকে অনেক মানুষ এসে আমার বাঁধনগুলো তাড়াতাড়ি খুলে দিল ফলে আমি ডান পাশে ফিরতে পারলাম এবং অনেকক্ষণ যাবৎ আটকে রাখা মূত্র ত্যাগ করতে লাগলাম। এই দৃশ্য দেখে এবং মূত্র-বন্যাস্রোতে ভেসে যাবার আতঙ্কে ক্ষুদে মানুষগুলো ইতস্তত ছিটকে পড়ল। ইতোমধ্যে তারা আমার মুখে ও হাতে তীর লাগা আহত স্থানগুলোতে সুগন্ধী একটা মলম লাগিয়ে দিয়েছিল যার ফলে আমার সকল জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়েছিল। ওরা আমাকে পর্যাপ্ত আহার ও পানীয় দিয়েছিল, পেট ভরে খেয়েছি। এখন যন্ত্রণারও উপশম হল ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি প্রায় আটঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম এবং পরে শুনেছিলাম যে সম্রাটের আদেশে রাজ-চিকিৎসক মদের পিপেতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি অনুমান করলাম যে আমি দ্বীপে পা দেওয়ার পর ঘুমিয়ে থাকার সময় কোনো দূত মারফত সম্রাট খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। সম্রাট তখন মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে বেঁধে ফেলার হুকুম দেন (যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখনি আমাকে বেঁধে ফেলা হয়েছিল) এবং কীভাবে বাঁধা হয়েছিল তাও আমি আগে বলেছি। তখন এও স্থির করা হয় যে আমার জন্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় পাঠানো হবে এবং রাজধানীতে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটা কোনো মেসিন তৈরি করা হবে।

সিদ্ধান্তটি দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক মনে হতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস যে এমন অবস্থায় ইউরোপের কোনো রাজা এমন আয়োজন করতেন না। আমার মতে এরা যা করেছে তা বিবেচনাপ্রসূত ও উদার। কারণ আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন ওরা তীর ছুঁড়ে ও বর্শার আঘাত করে আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে পারত। তাহলে প্রথম আঘাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হত এবং ক্রোধান্বিত হয়ে আমি বলপ্রয়োগ করে আমার বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হত্যা করতে পারতাম, ওরা বাধা দিতে পারত না। আমার দয়াও আশা করতে পারত না। এই ক্ষুদে মানুষগুলো গণিত বিদ্যায় পারদর্শী এবং সম্রাটের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ওরা যথেষ্ট কারিগরিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে। গাছের গুঁড়ি ও ভারী ওজন বইবার জন্যে রাজকুমার কয়েকটা মেসিনের চাকা বসিয়েছে। বনে যেখানে উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায় সেখানে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ তৈরি করেছে যার মধ্যে কয়েকটা ন'ফুট লম্বা।

তারপর সেগুলো ঐ চাকাওয়ালা ইঞ্জিনে চড়িয়ে তিন চারশ গজ দূরে সমুদ্রে নিয়ে গেছে। সর্বাপেক্ষা বড় ইঞ্জিন তৈরি করবার জন্যে তারা অবিলম্বে পাঁচশ ছুতোর ও ইঞ্জিনিয়ার লাগিয়ে দিল। কাঠের একটা ফ্রেম তৈরি হল সাত ফুট লম্বা চার ফুট চওড়া, মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঁচু যাতে বাইশটা চাকা লাগানো হল। আমি দ্বীপে পৌছবার চার ঘণ্টা পরেই এটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিল। একটু আগে যে গোলমাল শুনেছিলাম তা হল ঐ ইঞ্জিনটির আগমন। আমার পাশেই ওটি সমান্তরালভাবে রাখা হল কিন্তু মূল সমস্যাটা হল আমাকে সেই যানটির উপর তোলা। এ জন্যে এক ফুট লম্বা আশিটা খুঁটি পোঁতা হল। ওদের মান অনুযায়ী মোটা দড়ির ডগায় হুক লাগানো হল, আমার গলায়। হাতে বুকে পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হল। সেই ব্যান্ডেজে হুক আটকে আমাকে তোলা হবে আর কি। খুঁটির মাথায় এবার পুলি (চাকা) লাগানো হল। তারপর হুকগুলো ব্যান্ডেজে আটকে ন'শ জন পালোয়ান হেঁইও হেঁইও করে প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আমাকে সেই গাড়িতে তুলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। এই কাজটা করা হয়েছিল যখন আমি সুরার সঙ্গে মেশানো সেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম। সম্রাটের সবচেয়ে বড় পনের শতটি ঘোড়া যেগুলোর উচ্চতা প্রায় সাড়ে চার ইঞ্চি, সেই গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর টানতে টানতে আধ মাইল দূরে আমাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আমাদের যাত্রা আরম্ভ হওয়ার চার ঘণ্টা পরে একটা মজার দুর্ঘটনার ফলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। পথে গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় মেরামতের জন্যে থামানো হয়েছিল। সেই সময়ে আমি কেমন করে ঘুমোচ্ছি তা দেখবার জন্যে কৌতূহল দমন করতে না পেরে দু-তিনটি স্থানীয় ছোকরা গাড়ির উপর উঠে পড়ে তারপর আমার গায়ের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমার মুখের উপর এসে ওঠে। তাদের মধ্যে একজন বুঝি ছিল রক্ষীদের হাবিলদার, সে আমার নাকের ভেতর তার বর্শার আর্ধেকটা ঢুকিয়ে দেয় ফলে আমার নাকে সুড়সুড়ি লাগে এবং আমি সজোরে ও সশব্দে এমন হাঁচি দিই যে ওরা উড়ে যায়। আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণটা আমি তিন সপ্তাহ পরে জানতে পেরেছিলাম। বাকি সময়টা দীর্ঘ যাত্রা। রাত্রি হল। বিশ্রাম নেবার জন্যে এক জায়গায় থামা হল। আমার দুদিকে পাঁচশ রক্ষী, তাদের অর্ধেকের হাতে তীর ধনুক। আমি নড়বার চেষ্টা করলেই আমাকে তীরবিদ্ধ করা হবে। পরদিন সকালে আবার যাত্রা এবং দুপুর নাগাদ নগর তোরণের দুশ গজের মধ্যে এসে পৌছলাম। আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সভাসদসহ সম্রাট স্বয়ং এসেছেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে কিছুতেই আমার শরীরের উপর উঠতে দেবেন না, কে জানে যদি তাঁর কিছু বিপদ ঘটে!

আমার গাড়ি যেখানে থামল তার কাছেই ছিল একটি প্রাচীন মন্দির, সারা রাজত্বে সবচেয়ে বড়। কিছুদিন পূর্বে এই মন্দিরে একটি অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেজন্যে মন্দিরটি কলুষিত বলে বিবেচিত হত। মন্দির থেকে সমস্ত রত্ন ও অলংকার এবং আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং মন্দিরটি বর্তমানে অন্য সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হত। সাব্যস্ত হল যে এই ভবনে আমাকে রাখা হবে। উত্তর দিকে সামনের ফটক চার ফুট উঁচু এবং প্রায় দুফুট চওড়া। গুটিয়ে গুটিয়ে আমি এর ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারি। গেটের দুপাশে দুট ছোটো জানলা, জমি থেকে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু। বাঁ দিকের জানলায় রাজার কামার একানব্বইটি শেকল লাগিয়ে দিল। ইউরোপে মেয়েদের ঘড়ি থেকে যেমন

চেন ঝোলে এই শেকলগুলো সেইরকম। সেই শেকল টেনে এনে আমার বাঁ পায়ে লাগিয়ে ছত্রিশটা তালা আটকে দেওয়া হল যাতে আমি পালাতে না পারি। এই মন্দিরের বিপরীত দিকে কুড়ি ফুট দূরে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটা গম্বুজ রয়েছে। আমাকে দেখবার জন্যে সম্রাট তাঁর দরবারের কয়েকজন অমাত্যকে নিয়ে সেই গম্বুজে উঠলেন। আমাকে দেখবার জন্যে আমার তো মনে হল শহর থেকে লাখখানেক মানুষ এসেছিল এবং প্রহরীদের বাধা উপেক্ষা করে হাজার দশ মানুষ মই বেয়ে আমার উপর উঠেছিল। কিন্তু একটি রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা আমার উপর ওঠা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। আদেশ উপেক্ষা করলে মৃত্যুদণ্ড। কর্মীরা যখন বুঝল যে আমার পক্ষে পলায়ন অসম্ভব তখন তারা আমার দেহবন্ধনগুলো কেটে দিল। তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম যদিও আমার মেজাজ যারপর নেই বিরক্ত। কিন্তু আমাকে উঠে দাঁড়াতে এবং চলতে দেখে তারা বিহ্বল হয়ে যে সোরগোল তুলল তা আর বলা যায় না। আমার বাঁ পায়ে যে শেকল আটকে দেওয়া হয়েছিল তা প্রায় দুগজ় লম্বা। ফলে আমি অর্ধ-বৃত্তাকারের মধ্যে আগু পিছু করে চলতে পারছিলাম। কিন্তু গেট থেকে মাত্র চার ইঞ্চি তফাতে আমার বাঁ পা শেকলে বাঁধা তবুও আমি গুঁড়ি মেরে মন্দিরের মধ্যে পুরো শরীরটা ঢুকিয়ে দিতে পারছিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[লিলিপুটদের সম্রাট কয়েকজন অমাত্যসহ লেখককে তার বন্দী অবস্থায় দেখতে এলেন। সম্রাটের চেহারা ও স্বভাবের বর্ণনা। লেখককে দেশের ভাষা শেখাবার জন্যে পণ্ডিত নিযুক্ত। তার অমায়িক ব্যবহারের জন্যে রাজানুগ্রহ লাভ। লেখকের পকেট সার্চ এবং তার তলোয়ার ও পিস্তল বাজেয়াপ্ত।]

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার চারদিক দেখলাম এবং স্বীকার করতেই হবে যে চারদিকের দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ। সারা দেশটাই মনে হল একটা বাগান আর ঘেরা জায়গাগুলো যা চল্লিশ বর্গ ফুট মতো হবে যেন এক একটি ফুলের কেয়ারি। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ তবে সবচেয়ে লম্বা গাছগুলো সাত ফুটের বেশি নয়। আমার বাঁ দিকে শহর ঠিক যেন মঞ্চে আঁকা দৃশ্য। যাহোক আমার প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পাদনের চাপ অসহ্য হয়ে উঠছিল। এসব কাজগুলো দুদিন বন্ধ আছে। আমি বাধ্য হয়ে গুঁড়ি মেরে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে কাজটা শেষ করলাম বটে কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝলাম অন্যায় হয়েছে। পরদিন প্রত্যুষে লোকজন আসবার আগেই আমি বাইরে আমার শেকলের গণ্ডির মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলতাম এবং দুজন লোক ঠেলাগাড়ি এনে সব পরিষ্কার করে নিয়ে যেত। এসব বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং আমি মানুষটা যে অবিবেচক বা অপরিষ্কার নই তা বোঝাবার জন্যেই এই অনভিপ্রেত প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হল।

দুঃসাহসিক কাজটা শেষ করার পর আমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম এবং কিছু তাজা বাতাস অনুভব করলাম। ইতোমধ্যেই সম্রাট সেই গম্বুজ থেকে নেমে এসেছেন এবং ঘোড়ায় চেপে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। ঘোড়াটি সুশিক্ষিত হলেও আর একটু হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারত কারণ ঘোড়াটি চলন্ত পাহাড় দেখতে অভ্যস্ত নয়,

অতএব অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখে সে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে, খাড়া উঠে দাঁড়াল। সম্রাট নিজেও সুকৌশলী অশ্বারহী, ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনি ছিটকে পড়লেন না। অবিলম্বে রক্ষীরা ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে চার পায়ের উপর দাঁড় করাল এবং সম্রাট ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। অবশ্য আমার শেকল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে। তারপর সম্রাট তাঁর পাচক ও সুরাভাণ্ডারীকে আদেশ দিলেন, আমাকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করতে। সব কিছু প্রস্তুত ছিল, তারা অবিলম্বে আদেশ পালন করল। চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর খাদ্য ও পানীয় সম্ভার থরে থরে সাজিয়ে তারা গাড়িগুলো আমার দিকে ঠেলে দিল। কুড়িটি গাড়িতে ছিল আমিষ খাদ্য আর দশটিতে সুরা। দুটি বা তিনটি গাড়ির খাবার দ্বারা আমি মুখ ভর্তি করতে লাগলাম আর সেই দশ পাত্র ভর্তি সুরাও শেষ হল। সুরা ভর্তি করা হচ্ছিল মাটির পাত্রে। এক এক পাত্র এক চুমুকেই শেষ। রাজকুমার রাজকুমারী ও কয়েকজন অভিজাত মহিলাসহ রানিও এসেছেন। তাঁরা দূরে চেয়ারে বসে আছেন কিন্তু ঘোড়া ক্ষেপে যাওয়ার পর তারা চেয়ার ছেড়ে উঠে রাজার কাছে এসেছিলেন। রাজাকে দেখতে কেমন? তাঁর সভাসদ অপেক্ষা রাজা বেশ লম্বা, শরীরের গঠন মজবুত ও পুরুষোচিত। অস্ট্রিয়ানদের মতো তাঁর ঠোঁট এবং ধনুকের মতো নাক, অলিভের মতো দেহবর্ণ, উন্নত কপাল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেও বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। চলন বলন রাজসিক কিন্তু একটা মাধুর্য আছে। বয়সে যৌবন উত্তীর্ণ, আটশ বছর পার হয়েছে। তার মধ্যে তিনি সাত বছর সগৌরবে রাজ্য শাসন করছেন। তাঁকে ভালো করে দেখবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে তাঁর দিকে পাশ ফিরলাম যাতে আমি তাঁর মুখ ভালো করে দেখতে পাই। তিনি তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে অবশ্য আমি তাঁকে অনেকবার আমার হাতের উপর তুলে নিয়েছিলাম এবং তাঁকে ভালো করে লক্ষও করেছি ও তাঁর নিখুঁত বর্ণনাই পেশ করেছি। তাঁর পোশাকটি না এশীয় না ইউরোপীয়। মাথায় ছিল রত্ন-খচিত স্বর্ণমুকুট যার শীর্ষে পালক শোভা পাচ্ছিল। যদি আমি আক্রমণ করি এই আশঙ্কায় আত্মরক্ষার জন্যে হাতে রেখেছিলেন খোলা তলোয়ার। তলোয়ারটি প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা। তলোয়ারের হাতল এবং খাপ যা কোমরে ঝুলছিল তা সোনার, ওপরে উজ্জ্বল হীরে বসানো। তাঁর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ কিন্তু উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট ও সাবলীল এবং আমি উঠে দাঁড়ালেও তাঁর কথা বেশ শুনতে পাচ্ছিলাম। মহিলা ও সভাসদদের পোশাক বেশ আড়ম্বরপূর্ণ। তারা সকলে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটি মনে হচ্ছিল যেন সোনা রুপোর কাজকরা মহিলাদের রঙিন সায়া বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহামান্য সম্রাট প্রায়ই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমিও উত্তর দিচ্ছিলাম কিন্তু আমরা কেউ কারও কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কয়েকজন পুরোহিত ও আইনবিদও (তাঁদের পোশাক দেখে আমি অনুমান করলাম) ছিলেন। রাজা তাঁদের আদেশ করলেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এবং আমিও কখনো উচ্চস্বরে, কখনো কোমল স্বরে নিজের ভাষায় এবং আমার যত ভাষা জানা ছিল যথা ডাচ, ল্যাটিন, ফরাসি, স্পেনীয়, ইটালিয়ান ভাষায় কথা বললাম কিন্তু বৃথা। প্রায় দু ঘণ্টা পরে সপারিষদ সম্রাট চলে গেলেন এবং কিছু অতি কৌতূহলী দর্শকদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবার জন্যে কড়া পাহারা রেখে গেলেন। তবুও দর্শকদের ঠেকানো যায় না। কয়েকজন বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে আমাকে লক্ষ্য করে

তীর ছুঁড়তে লাগল, একটা তীর তো আর একটু হলেই আমার বাঁ চোখে বিঁধে যেত। রক্ষীবাহিনীর কর্নেল ওদের ছ জনকে ধরে ফেললেন। তিনি ভাবলেন আমার হাতে ছেড়ে দিলেই ওদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। এই মনে করে সে সেই ছ'জনকে আমার হাতের কাছে নিয়ে এল তার বর্শার খোঁচা দিতে দিতে। আমি আমার ডান হাত দিয়ে তাদের খপ করে ধরে ফেললাম, পাঁচজনকে আমার পকেটে রাখলাম এবং একজনকে আমার হাতে তুলে নিয়ে আমার মুখের সামনে এনে এমন ভঙ্গি করলাম যে তাকে বুঝি জ্যান্ত খেয়েই ফেলব। বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগল। তারপর আমি পকেট থেকে যখন আমার পেনসিলকাটা ছুরি বার করলাম তখন তো কর্নেল ও তার সঙ্গীরা সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আমি তাদের ভয় ভেঙে দিলাম। বন্দীর বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিতেই সে ছুটে পালাল। পকেটে যারা ছিল তাদেরও একে একে বার করে আমি ছেড়ে দিলাম। লক্ষ করলাম যে আমার রক্ষীগণ ও সমবেত জনতা আমার এই দয়া দেখে বেশ প্রীত হল এবং তারা এই ঘটনাটি আমার অনুকূলে রাজসভায় জানিয়েছিল।

রাত্রে আমার বাড়িতে ঘুমোতে বেশ অসুবিধে হত তবুও পনের দিন আমাকে স্রেফ মাটির উপর মেঝেতে বেশ কষ্ট করে শুতে হয়েছিল। ইতোমধ্যে রাজামশাই আমার জন্যে বিছানা তৈরি করার হুকুম দিয়েছিলেন। গাড়ি বোঝাই করে ওদের মাপের ছশ বিছানা আনা হল এবং দেড়শটি করে বিছানা প্রথমে আমার মাপ অনুযায়ী সেলাই করে চারভাঁজ করা হল। তারপর সেই মাপে বিছানার চাদর, ঢাকা ও গায়ে দেবার কম্বলও তৈরি করে দেওয়া হল। এ মন্দের ভালো হল কারণ আমাকে কষ্ট করে শুতে হচ্ছিল পাথরের মেঝেতে।

আমার আগমনবার্তা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ধনী দরিদ্র, অলস বা কৌতূহলী মানুষ শয়ে শয়ে আমাকে দেখতে আসতে লাগল। ফলে গ্রাম খালি হয়ে যেতে লাগল, চাষ ও ঘর গেরস্থালী কাজের ক্ষতি হতে লাগল। তখন সম্রাট ঘোষণা করলেন কাজের ক্ষতি করে এভাবে দলে দলে আসা চলবে না। আমাকে দেখতে হলে রাজসভায় সচিবের কাছে ফি জমা দিতে অনুমতি পত্র নিতে হবে এবং আমার বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসা চলবে না।

ইতোমধ্যে সম্রাট তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ করছেন আমাকে নিয়ে কী করা হবে। পরে আমি আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু যিনি রাজসভার অনেক গুপ্ত খবর জানতেন তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে আমাকে নিয়ে ওরা বেশ অসুবিধেয় পড়েছেন। তাঁদের ভয় আমি যে কোনো সময়ে আমার শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারি। তারপর আমাকে খাওয়ানো এক বিরাট সমস্যা, খরচ তো অনেক বটেই উপরন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ হয়ে যেতে পারে আমাকে খাওয়াতে যেয়ে। এক সময়ে ওরা স্থির করেছিল আমাকে অনাহারে রেখে মেরে ফেলবে কিংবা আমার মুখ ও হাতে বিষাক্ত তীর মেরে আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু আর এক সমস্যা। মরে গেলে আমার বিরাট মৃতদেহ নিয়ে কী করবে? সেটা তো পচবে, শহরে মড়ক দেখা দেবে। সারা রাজ্যেও মড়ক ছড়িয়ে যেতে পারে। আমাকে নিয়ে যখন এই আলোচনা চলছে তখন সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন অফিসার মন্ত্রণাসভার দ্বারে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হল। তাঁরা আমার বিষয়ে একটা

বিবৃতি দেন। বিশেষ করে আমি যে ছ'জন অপরাধীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি তা শুনে মহামান্য সম্রাট এবং তাঁর সভাসদ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে মত পরিবর্তন করেন। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে এক ঘোষণা জারি করেন যে রাজধানীর ন'শ গজের মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম আছে তাদের আমার আহারের জন্যে প্রতিদিন সকালে ছ'টি গরু, চল্লিশটি ভেড়া এবং অন্যন্যা আহার্য দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে রুটি, সুরা ও অন্যান্য পানীয়ও দিতে হবে। এইসবের যথাযোগ্য দাম দেবার জন্যেও সম্রাট তাঁর কোষাগারকে নির্দেশ দিলেন।

রাজার নিজস্ব খাস ভূসম্পত্তি থেকে আয় আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জরুরি সময়ে প্রজাদের উপর এরকম চাপ মাঝে মাঝে পড়ে, যেমন যুদ্ধের সময়ে। আমার ঘর-গেরস্থালী কাজের জন্যে একটি সংস্থা গঠিত হল যেজন্যে ছ'শ ব্যক্তি নিযুক্ত করা হল। তাদের থাকবার জন্যে আমার সুবিধামতো আমার বাড়ির দুধারে তাঁবু ফেলা হল এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বেতনেরও ব্যবস্থা করা হল। দেশর ফ্যাশন অনুযায়ী আমার পোশাক তৈরির জন্যে তিনশ দর্জি নিয়োগ করা হল। সম্রাটের সেরা ছ'জন পণ্ডিতকে নিয়োগ করা হল আমাকে দেশের ভাষা শেখাবার জন্যে। সম্রাট আরো নির্দেশ দিলেন যে তাঁর এবং মান্যবর ব্যক্তিদের ও সম্রাটের রক্ষীদের অশ্বারূঢ়বাহিনী এখন থেকে আমার সামনে কুচকাওয়াজ করবে যাতে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় সহজ হয় এবং আমিও তাদের রীতিনীতি জানতে পারি। সম্রাটের সমস্ত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতে থাকল এবং আমিও প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদের ভাষা অনেকটা শিখে ফেললাম। এই সময়ের মধ্যে সম্রাট কয়েকবার আমার কাছে এসে আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং ভাষা শিক্ষাদানে আমার শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আপাতত আমরা উভয়ে কাজ চালানো ভাষায় কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছিলাম।

প্রথম যে শব্দগুলো আমি আয়ত্ত করেছিলাম তার দ্বারা আমি প্রতিবারই নতজানু হয়ে রাজার কাছে আবেদন করতাম তিনি যেন আমাকে মুক্তিদান করেন। তিনি বললেন আমার মুক্তিদানের ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ, মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এবং তার আগে আমাকে অবশ্যই তাঁর প্রতি এবং তাঁর রাজ্যের প্রতি আমার তরফ থেকে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তিনি আরো বললেন যে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে এবং ইতোমধ্যে আমি যেন ধৈর্য সহকারে তাঁর এবং তাঁর প্রজাদের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করতে শিখি। তিনি এহেন ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন যে আমাকে যদি সার্চ করার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে আমি যেন কিছু মনে না করি কারণ আমার কাছে যেসব অস্ত্র আছে সেগুলো বিপজ্জনক। বুঝলাম যে প্রজাদের ভয় থেকে মুক্তি দেওয়াই রাজার উদ্দেশ্য। আমি কথায় ও ইশারায় রাজাকে বললাম যে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি আমার পোশাক খুলে ফেলতে প্রস্তুত আছি এবং আমার পকেটগুলো উলটে তাঁকে দেখাতে পারি। কিন্তু বললেন যে, রাজ্যের আইন অনুসারে আমাকে তাঁর দুজন অফিসার সার্চ করবেন তবে এজন্যে তাঁরা আমার অনুমতি নেবেন ও আমার সহযোগিতা চাইবেন। আমার উদারতা ও বিচার বুদ্ধির উপর তাঁদের বিশ্বাস জন্মেছে এবং তিনি আমাকে সার্চ করবার জন্যে নির্ভয়ে অফিসার প্রেরণ করতে পারেন কারণ আমি তাদের কোনো ক্ষতি করব না। অফিসাররা যদি আমার কোনো জিনিস আটক করে তাহলে আমি যখন এই

দেশ ছেড়ে চলে যাব তখন সেগুলো আমাকে ফেরত দেওয়া হবে অথবা আমি যে দাম ধার্য করে দেব তারা সেই মতো দাম মিটিয়ে দেবেন। দুজন অফিসার এলেন, আমি তাঁদের আমার হাতের চেটোয় তুলে নিলাম তারপর প্রথমে আমি তাদের আমার কোটের পকেটে এবং অন্য পকেটে নামিয়ে দিলাম কিন্তু আমার যে ঘড়ির বা চোরা পকেট ছিল সেগুলো তাদের দেখতে দিলাম না কারণ সেইসব পকেটে আমার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সামগ্রী আছে যা কারো কাজে লাগবে না। ঘড়ির পকেটে আমার রুপোর ঘড়ি ছিল এবং একটি চোরা পকেটে একটা থলেতে কিছু সোনা ছিল। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কালি, কলম ও কাগজ ছিল। আমাকে সার্চ করে তারা যা দেখেছে তার একটা বিস্তারিত তালিকা লিখে ফেলল। তালিকাটি তারা সম্রাটকে দেখাবে। ওদের তালিকা দেখে আমি সেটি যথাযথ ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিলাম। তালিকাটি এরকম :—প্রারম্ভে। বিশাল মানুষ-পাহাড়ের (ওদের 'কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন' শব্দ দুটির অনুবাদ) ডান দিকের কোটের বুকপকেট খুঁটিয়ে সার্চ করে আমরা এমন একটা চৌকো মোটাকাপড় পেলাম যেটি মহামান্য সম্রাটের স্টেটরুমে বিছিয়ে দেওয়া যায়। বাঁদিকের পকেটে পাওয়া গেল রুপোর একটি মস্ত বড় বাক্স যার ঢাকনাটিও ঐ একই ধাতুর তৈরি কিন্তু আমরা অনুসন্ধানকারীরা ঢাকনাটি তুলতে পারছিলাম না। আমরা সেটি খুলতে চাই কিন্তু পারছি না। অবশেষে বাক্স খোলা গেল তখন আমাদের একজন বাক্সের মধ্যে নামতেই একটা নরম গুঁড়ো পদার্থের মধ্যে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল এবং সেই গুঁড়ো পদার্থ কিছুটা ছিটিয়ে পড়তে আমাদের নাকে মুখে লাগল এবং আমরা হাঁচতে আরম্ভ করলাম। তার ওয়েস্টকোটের ডান দিকের পকেটে কোনো সাদা পাতলা পদার্থের বেশ পুরু একটা বান্ডিল। বান্ডিলটি তার দিয়ে বাঁধা এবং কালো সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। বোধহয় কিছু লেখা আছে। প্রতিটি অক্ষর আমাদের হাতের চেটোর সমান। বাঁদিকে ইঞ্জিনের মতো কী একটা রয়েছে যা থেকে লম্বা লম্বা দাড়া বেরিয়েছে। আমাদের অনুমান এইটি দিয়ে মানুষ পাহাড় তার চুল আঁচড়ায়। অনুমান এই জন্যে যে আমরা তাকে বার বার প্রশ্ন করে বিরক্ত করি নি কারণ আমাদের কথা তাকে বোঝাতে বেগ পেতে হচ্ছিল। তার কোমরের নিচে পরিহিত রানফু-লো (ব্রিচেস)-এর ডান বড় পকেটে এক মানুষ সমান লম্বা ফাঁপা লোহার তৈরি একটা স্তম্ভ পেলাম আর সেই স্তম্ভের সঙ্গে কাঠ ও লোহার তৈরি কিছু লাগানো রয়েছে। এটি কী বস্তু আমরা বুঝতে পারলাম না। বাঁদিকের পকেটে অনুরূপ একটি ইঞ্জিন ছিল। ডানদিকে একটি ছোটো পকেটে কতকগুলো সাদা ও লাল ধাতু নির্মিত চাকতি রয়েছে, কয়েকটা সরু বা মোটা কিংবা ছোটো ও বড়, নানা আকারের। সাদা চাকতিগুলো বোধহয় রুপোর তৈরি কিন্তু এত ভারী যে সেগুলো আমরা তুলতেই পারছিলাম না। বাঁদিকের পকেটে বিচিত্র আকারের দুটো কালো থামের মতো বস্তু ছিল কিন্তু আমরা পকেটের নিচে থাকায়, উপরটা দেখতে পারছিলাম না তবু আমাদের মনে হয়েছিল সে দুটি বিপজ্জনক কিছু হবে। তখন আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম। সেদুটি সে বার করে আমাদের খুলে দেখিয়ে বলল যে একটি দিয়ে সে দাড়ি কামায়, আর অপরটি দিয়ে মাংস কাটে। তার সেই রানফু-লো-এর ওপরে কোমরে দুটো ছোটো ছোটো পকেট রয়েছে যার মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারি নি। ডান দিকের পকেট থেকে ঝুলছিল রুপোর একটা চেন। চেনের শেষে কী আছে তা দেখবার জন্যে আমরা সেটি বার করতে বললাম। চেনটিতে টান

দিয়ে সে বেশ বড় গোলাকার একটি বস্তু বার করল যার এক পিঠ ধাতু নির্মিত আর অপর পিঠ কোনো স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে ঢাকা। সেই স্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোলাকার পদার্থটির ভেতর কিনারা বরাবর একই মাপ বজায় রেখে বেশ বড় দাগ আর ফাঁকে ফাঁকে ছোটো দাগ। দাগগুলো আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে গেলাম কিন্তু সেই স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করতে পারলাম না। বস্তুটি যে আমাদের কানের কাছে নিয়ে এল। ভেতরে ক্রমাগত একটা শব্দ হচ্ছে যেন ওয়াটার মিল চলছে। আমরা অনুমান করলাম এটা কোনো অচেনাপ্রাণী অথবা তার পুজো করবার নিজস্ব কোনো দেবতা। দেবতাই হবে বোধহয় কারণ আমরা তাকে প্রশ্ন করতে সে বলল ওরই নির্দেশে সে চলে তার সঙ্গে পরামর্শ না করে সে কিছু করে না এবং তার জীবনের সব কাজের সময় সে ঠিক করে দেয়। বাঁ দিকের ছোটো পকেট থেকে সে একটা জালের থলে বার করল। সেটা আমাদের জেলেদের জালের মতো বড় হবে। থলেটা বেশ খোলা ও বন্ধ করা যায়। থলের ভেতর থেকে সে কতকগুলো বেশ ভারী হলদে ধাতব পদার্থ বার করল। সেগুলো যদি সোনা হয় তাহলে তো অনেক দাম।

মহামান্য সম্রাট আপনার আদেশ অনুসারে পাহাড়-মানুষের সমস্ত পকেট সার্চ করে দেখলাম তার কোমরে পুরু চামড়ার একটা কোমরবন্ধনী রয়েছে। কোমর বন্ধনীটা বিরাট একটা পশুর চামড়া থেকে তৈরি নিশ্চয়। কোমর বন্ধনীর বাঁ দিক থেকে ঝুলছে একটা তলোয়ার যা লম্বায় আমাদের মতো পাঁচটা মানুষের সমান হবে। কোমর বন্ধনীর ডান দিকে রয়েছে একটা ব্যাগ যার দুটো ভাগ। প্রতি ভাগে সম্রাটের তিনজন প্রজার স্থান হতে পারে। একটি ভাগে অনেকগুলি ধাতব বল বা গুলি রয়েছে। এক একটা বল আমাদের মাথার সমান। বেশ ভারী, তুলতে শক্তির দরকার। ব্যাগের অপর ভাগে গুঁড়ো গুঁড়ো দানার মতো কিছু পদার্থ রয়েছে, কালো রং তবে দানাগুলো ভারী নয়। আমরা আমাদের হাতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত দানা তুলতে পারছিলাম। পাহাড়-মানুষের দেহ সার্চ করে আমরা যা পেয়েছি তার তালিকা পেশ করলাম। উনি মহামান্য সম্রাটের আদেশ পালন করেছেন এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্যে প্রদর্শন করেছেন। মহামান্য সম্রাটের শাসনারম্ভ থেকে ঊননব্বইতম চন্দ্রের চতুর্থ দিবসে আমাদের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সীল মোহরাঙ্কিত করে পেশ করা হল।

ক্লেফরেন ফ্রেলক, মারসি ফ্রেলক

এই তালিকা সম্রাটকে শোনালো হল, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন কতকগুলো সামগ্রী দাখিল করতে, প্রথমে চাইলেন আমার তলোয়ারটি। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর বাছা বাছা তিন হাজার সৈন্যকে আদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন আমাকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের ধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাকে, আদেশ পেলেই তীর ছুঁড়বে। কিন্তু আমার দৃষ্টি সেদিকে ছিল না, আমি পুরোপুরি সম্রাটের দিকেই চেয়েছিলাম। সম্রাট বললেন তলোয়ারটি বার করতে। সমুদ্রের জল লেগে তলোয়ারটির কোনো কোনো জায়গায় মর্চে পড়ে গলেও প্রায় সবটাই খুব ঝকঝকে ছিল। আমি খাপ থেকে সড়াৎ করে তলোয়ারটা বার করে নাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা ভয়ে চমকে উঠল। চকচকে তলোয়ারের উপর থেকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। ভেবেছিলাম সম্রাটও ভয় পাবেন কিন্তু তাঁর সাহস আছে। তিনি অবাক হলেও ভয় পান নি। আমাকে বললেন তলোয়ারটি খাপে পুরে মাটিতে আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখতে। আমি আমার পায়ে বাঁধা শেকল থেকে ছ

ফুট দূরে সেটি নামিয়ে রাখলাম। তারপর তিনি চাইলেন লোহার ফাঁপা থামওয়ালা যন্ত্রটি অর্থাৎ আমার পিস্তলটি। তাঁর ইচ্ছানুসারে আমি পিস্তলটি বার করলাম এবং সেটি কী করে ব্যবহার করতে হয় তা দেখিয়ে দিতে চাইলাম। আমি পিস্তলে আপাতত শুধু বারুদ ভরলাম। সমুদ্রের পানিতে কিছু বারুদ ভিজে গিয়েছিল তবুও অধিকাংশ শুকনো ছিল। আমি শুকনো বারুদই ভরলাম এবং সম্রাটকে বললাম এবার যা ঘটবে সেজন্যে যেন তিনি ভয় পান না। তারপর আমি আকাশের দিকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুঁড়লাম। আমার তলোয়ার দেখে তাদের যতখানি চমক লেগেছিল তার চেয়ে পিস্তলের আওয়াজ ওদের অনেক বেশি চমকিত করল। কয়েকশ মানুষ তো এমনভাবে মাটিতে পড়ে গেল যেন তারা মরে গেছে। রাজা যদিও প্রকাশ করলেন না তবুও বোঝা গেল তিনি বেশ ভয় পেয়েছেন। আমি যেভাবে তলোয়ারটি দিয়েছিলাম ঠিক সেইভাবে পিস্তল এবং বারুদ ও বুলেটের ব্যাগ নামিয়ে রেখে রাজাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম ব্যাগটি যেন তিনি আগুন থেকে দূরে রাখেন কারণ এতে একটি স্ফুলিঙ্গ লাগলেই যে বিস্ফোরণ ঘটবে তাতে সম্রাটের প্রাসাদ উড়ে যাবে। আমার ঘড়িটিও আমি একইভাবে নামিয়ে রাখলাম। ঘড়িটি সম্বন্ধে রাজাকে যথেষ্ট কৌতূহলী মনে হল। তিনি তাঁর দুজন দেহরক্ষীকে বললেন ঘড়িটির মাথার রিং-এর মধ্যে একটা ডাণ্ডা ঢুকিয়ে ঘড়িটা তুলে ধরতে ইংল্যান্ডে এইভাবে মদের পিপে বয়ে নিয়ে যায়। ঘড়ির অবিরত টিক টিক শব্দ রাজাকে অবাক করে দিল। ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, ওদের দৃষ্টিও খুব প্রখর। মিনিটের কাঁটাটি আপনা আপনি এগিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি অবাক। ঘড়ি সম্বন্ধে তিনি তাঁর পণ্ডিতদের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন তবে তারা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি কলতে লাগল তা আমি ভালো শুনতেও পেলাম না, বুঝতেও পারলাম না। তারপর আমি আমার রুপোর ও তামার মুদ্রাগুলো, ন'টি বড় ও কিছু ছোটো সোনার টুকরো সমেত থলেটি, ছুরি ও ক্ষুর, চিরুনি, রুপোর নস্যদানি, রুমাল এবং দিনলিপির খাতা রাজার সামনে একে একে রাখলাম। তলোয়ার পিস্তল এবং বারুদ ও বুলেটের পাউচ সম্রাট তাঁর ভাণ্ডারে তুলে রাখবার নির্দেশ দিলেন কিন্তু বাকি জিনিসগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

আমার আর একটি গুপ্ত পকেট ছিল সেটি অনুসন্ধানকারীরা দেখতে পায় নি। সেই পকেটে আমার চশমা ছিল। আমার দৃষ্টির কিছু ত্রুটি আছে তাই মাঝে মাঝে সেটি পরি, একটি পকেটে দূরবীন এবং আরো কয়েকটা টুকিটাকি। এগুলো রাজার কোনো কাজে লাগবে না তাই আমি আর ওগুলো পকেট থেকে বার করলাম না। তাছাড়া আমার ভয় ছিল যে ওগুলো আমার হাতছাড়া হলে ভেঙে বা হারিয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[লেখক সম্রাট ও তাঁর পুরুষ ও নারী সভাসদদের কিছু ক্রীড়াকৌশল দেখালেন। লিলিপুটদের ক্রীড়ানুষ্ঠান। কয়েকটি শর্তে লেখককে স্বাধীনতা দেওয়া হল।]

আমার সদ্ব্যবহার, ভদ্রতা, সম্রাট ও তাঁর সভাসদ, সামরিক বিভাগ ও জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। তাঁরা সকলেই সন্তুষ্ট বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার

আরো মনে হচ্ছে যে শীঘ্রই আমি মুক্তি লাভ করব। যাতে আমি সকলের মন যুগিয়ে চলে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারি। আমি সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। স্থানীয় ব্যক্তিরাও ক্রমশ বুঝতে পারছে যে আমি তাদের কোনো ক্ষতি করব না। যেমন আমি মাঝে মাঝে শুয়ে পড়তাম এবং সেই সময়ে পাঁচ ছ'জন লিলিপুট যদি আমার হাতের চেটোয় উঠে নৃত্য আরম্ভ করে দিত তাহলে আমি কখনো বাধা দিতাম না। ছোটো ছেলেমেয়েরাও ক্রমশ সাহসী হয়ে আমার চুলের মধ্যে লুকোচুরি খেলত। আমি এখন ওদের ভাষা বেশ বুঝতে পারি এবং ওদের ভাষাতে কথাও বলতে পারি। সম্রাটের একদিন ইচ্ছে হল দেশীয় কিছু ক্রীড়া দেখিয়ে আমার চিত্তবিনোদন করবেন। নানারকম খেলাধুলায় লিলিপুটরা বেশ পারদর্শী এবং অনেক দেশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মাটি থেকে বার ইঞ্চি উপরে ও দু ফুট দীর্ঘ দড়ির (আমার চোখে সুতো) উপর তাদের খেলাগুলো দারুণ। পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হলেও আমি এ বিসয়ে কিছু বলব। রাজসভায় যারা বড় চাকরির প্রার্থী তাদের এই দড়ির খেলা শিখতে হয়। যে কোনো পরিবারের অথবা অল্প শিক্ষিত প্রার্থীরা যুবা বয়স থেকেই এই দড়ির খেলা শিখতে থাকে। যখনি কোনো বড় পদ খালি হয়, সে মৃত্যুর জন্যেই হোক বা অসাধুতার জন্যে কর্মচ্যুত হলে, প্রার্থীরা উক্ত শূন্য পদের জন্যে আবেদন করে। তখন সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের মনোরঞ্জনের জন্যে দড়ির খেলা দেখাতে হয়। মাটিতে না পড়ে যে সবচেয়ে উঁচুতে লাফাতে পারবে শূন্য পদটি তাকেই দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এবং তিনি যে তাঁর কর্মকুশলতা অব্যাহত রেখেছেন তা দেখাবার জন্যে সম্রাট তাঁকেও দড়ির খেলা দেখাতে আহ্বান করেন। কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপকেও মাঝে মাঝে লাফিয়ে দড়ি ডিঙোতে বলা হয় তবে এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের যে কোনো সম্মানীয় প্রতিযোগী অপেক্ষা তাঁর জন্যে দড়ি এক ইঞ্চি উঁচুতে ধরা হয়। কোষাধ্যক্ষ মশাই এই খেলাটি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত কৌশলও দেখাতেন। পক্ষপাতিত্ব না করেও বলতে পারি যে আমার বন্ধু ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কীয় মুখ্য সচিব রেলড্রিসালও বড় কম যায় না, কোষাধ্যক্ষের পরেই তাঁর স্থান আর বাকি সব বড় অফিসাররা মোটামুটি কৌশলী।

এই প্রতিযোগিতায় মাঝে মাঝে মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটে, সংখ্যা বড় কম নয়। আমি নিজেই দু'তিন জন প্রার্থীকে হাত পা ভাঙতে দেখেছি। কিন্তু বিপদটা আরো বড় আকারে দেখা যায় যখন মন্ত্রীরা স্বয়ং প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। কারণ তাঁরা তাঁদের সহকর্মী অপেক্ষা যে সেরা তা প্রমাণ করবার জন্যে নিজ ক্ষমতা অপেক্ষা শক্তি প্রয়োগ করে ফলে তারা প্রায়ই আহত হয়। আমি এই দ্বীপে আসবার দু'এক বছর আগে আমার বন্ধু ফ্লিমন্যাপ তার ঘাড় ভেঙে ফেলত যদি না ভাগ্যক্রমে রাজার একটি কোমল কুশন তার পতনের স্থানে পড়ে থাকত।

আরো একটি ক্রীড়া আছে। কিন্তু সেটি বিশেষ উপলক্ষে কেবল সম্রাট ও তাঁর প্রথম সারির মন্ত্রীদের সমক্ষে দেখান হয়। সম্রাট তাঁর টেবিলের উপর ছ'ইঞ্চি মাপের সিলকের তিনটি সরু সুতো রাখেন। প্রথমটি নীল, দ্বিতীয়টি লাল এবং তৃতীয়টি সবুজ। সম্রাট যদি কাউকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ দেখাতে চান তখন এইগুলো তাদের শক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ উপহার দেওয়া হয়। তবে তাদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হয়। প্রতিযোগিতাটি হয় সম্রাটের আড়ম্বর পূর্ণ চেম্বার অফ স্টেট হলে। এখানে প্রার্থীদের যে প্রতিযোগিতায় যোগ

দিতে হয় তা আগে প্রতিযোগিতা থেকে ভিন্ন এবং এ ধরনের ক্রীড়া আমি পৃথিবীর কোথাও দেখি নি।

সম্রাট দিকচক্রবালের সঙ্গে উভয় প্রান্ত সমান্তরাল রেখে হাতে একটি ছড়ি ধরেন এবং প্রার্থীদের কখনো ছড়িটি কয়েকবার লাফিয়ে অতিক্রম করতে হয়, আবার কখনো সামনে দিয়ে বা পিছন ফিরে ছড়ির নিচ দিয়ে যেতে হয়। সম্রাট অবশ্য ছড়িটি ইচ্ছামতো উঁচু নিচু বা এ পাশ ও পাশ করেন। সময় সময় তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছড়ির অপর প্রান্ত ধরেন আবার কখনো প্রধানমন্ত্রী একাই ছড়িটি ধরেন। যে সর্বাপেক্ষা সহজে ছড়ির উপর বা নিচে দিয়ে ছড়িটি অতিক্রম করতে পারে তাকে নীল সুতো উপহার দেওয়া হয়। পরবর্তী স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয় লাল সুতো এবং তৃতীয় ব্যক্তি পায় সবুজ সুতো। বিজয়ীরা এই রঙিন সুতো তাদের কোমরে বাঁধে। কোমরে এরকম রঙিন বন্ধনীযুক্ত অনেক অফিসারকে রাজসভায় দেখা যায়।

রাজার অশ্বশালার যোদ্ধাদের ঘোড়াগুলোও আমাকে চিনে নিয়েছিল। তারা আমাকে আর ভয় পেত না এবং আমার পায়ের খুব কাছে আসত। আমি মাটিতে হাত পাততাম আর অশ্বারোহী লাফিয়ে আমার হাতে নামত। একবার সম্রাটের একজন শিকারি তো তার ঘোড়ায় চড়ে আমার জুতোসমেত পা লাফিয়ে পার হয়েছিল। নিশ্চয় খুব কৃতিত্বের ব্যাপার। সম্রাটকে কতকগুলো অন্যরকমের খেলা দেখাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার নিজের খেলা নয়, লিলিপুটদের দিয়েই আমি খেলা দেখিয়েছিলাম। আমি সম্রাটকে বললাম দু'ফুট লম্বা এবং সাধারণ একগাছা বেতের মতো পুরু কিছু ছড়ি আমাকে আনিয়ে দিন। সম্রাট তখনি তাঁর বনবিভাগের মন্ত্রীকে সেইমতো আদেশ দিলেন। পরদিন সকালেই ছ'খানা আটঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে ছ'জন কাঠুরিয়া ছড়ি এনে হাজির। আমি ছড়ি বলছি কিন্তু ওদের কাছে এগুলো কাঠের মোটা গুঁড়ির সমান। আমি ন'খানা ছড়ি বেছে নিলাম তারপর সেগুলো চারদিকে পোঁতা ছড়িগুলার সঙ্গে মাটিতে শুইয়ে বেঁধে রাখলাম। তারপর আমি আমার রুমালখানা বেশ টান টান করে ঐ ন'টা ছড়ির মাথায় লাগিয়ে মাটিতে পোঁতা কাঠিগুলোর সঙ্গে বেঁধে দিলাম। তার মানে একখানা সামিয়ানা টাঙানো হল আর কি। কিন্তু ঢিলেঢালা নয় বেশ মজবুত করেই বেঁধে দিলাম। আমার কাজ শেষ করে আমি সম্রাটকে অনুরোধ করলাম বাছা বাছা চব্বিশ জন অশ্বারোহীকে আনতে। তারা আমার খাটানো এই সামিয়ানার উপর তাদের ক্রীড়াকৌশল দেখাবে। আমার প্রস্তাব সম্রাট অনুমোদন করলেন এবং অশ্বারোহী আনবার জন্যে হুকুম দিলেন। অশ্বারোহীরা আসতে আমি তাদের সবাইকে কাপ্তেন ও অস্ত্রশস্ত্র সমেত আমার খাটানো রুমাল-সামিয়ানার উপর তুলে দিলাম। তারা সার দিয়ে দাঁড়াল। এরপর ওরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং তাদের তলোয়ার ও ভোঁতা তীর বা ভোঁতা বর্শা বার করে নকল যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। একদল আক্রমণ করে, অপর দল আক্রমণ প্রতিহত করে এবং পাল্টা আক্রমণ করে। বেশ মজার অথচ উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। এমন চমৎকার কুচকাওয়াজ আমি দেখি নি। আমার রুমালটি বেশ মজবুত করেই বাঁধা ছিল, ওদের অসুবিধে হচ্ছিল না, যেন মাঠেই খেলা দেখাচ্ছে। এই কুচকাওয়াজ দেখে রাজা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করলেন এবং এই খেলা পরপর কয়েকদিন চলবার আদেশ দিলেন। সম্রাট খেলাটি এতদূর উপভোগ করলেন যে তিনি আমাকে বললেন তাঁকে সামিয়ানার উপর

তুলে দিতে। তখন তিনি নিজেই তাঁর ঘোড়সওয়ারদের আদেশ দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয় তিনি আমাকে বললেন সিংহাসন সমেত মহারানিকে তুলে ধরে রাখতে যাতে তিনিও খেলাটি ভালো করে দেখতে ও উপভোগ করতে পারেন। আমি মহারানিকে মঞ্চ থেকে দু'গজ দূরে তুলে ধরে রাখলাম। সেখান থেকে তিনিও খেলা দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। আমার ভাগ্য ভালো যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। কেবল একটা তেজী ঘোড়া রুমালে একটা সরু ছিদ্রে পা ঢুকিয়ে ফেলেছিল ফলে সে নিজেও পড়ে যায় এবং তার আরোহী কাপ্তেনকেও ফেলে দেয়। আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ওদের তুলে দিয়েছিলাম। পরে আমি একহাত দিয়ে ফুটোটি বন্ধ করে অপর হাত দিয়ে ঘোড়সওয়ারদের একে একে সামিয়ানার উপর থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম। যে ঘোড়াটা পড়ে গিয়েছিল তাঁর বাঁদিকের কাঁধে আঘাত লেগেছিল কিন্তু কাপ্তেনের কোনো আঘাত লাগে নি। রুমালটি আমি মেরামত করে দিয়েছিলাম তবে ঐ খেলার পুনরাবৃত্তি করতে আমি আর সাহস করি নি। রুমালটির উপর দিয়েও ধকল গেছে, জীর্ণ হয়েছে।

আমি মুক্তিলাভের দু'তিন দিন আগে যখন নানা অনুষ্ঠান মারফত সম্রাটের চিত্তবিনোদন করছিলাম সেই সময় একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত ছুটে এসে সম্রাটকে খবর দিল যে দ্বীপে যেখানে আমি অবতরণ করেছিলাম সেখানে মস্ত বড় কালো রঙের একটা জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটার আকার বড় অদ্ভুত। মাঝখানটা মানুষ সমান উঁচু আর চারদিক ঘিরে চওড়া বারান্দা মতো। প্রথমে ভেবেছিল এটা বুঝি কোনো প্রাণী কিন্তু পরে লক্ষ করে দেখল ওটা ঘাসের উপর শুধু পড়ে আছে, নিশ্চল। কেউ কেউ সাহস করে একজনের ঘাড়ে চেপে জিনিসটার মাথায় উঠল। মাথাটা চ্যাপ্টা, পা চেপে বোঝা গেল ওটা ফাঁপা। তাদের অনুমান জিনিসটি পাহাড়-মানুষের এবং মাননীয় সম্রাট আদেশ দিলে ওরা পাঁচটি ঘোড়া নিয়ে গিয়ে জিনিসটি নিয়ে আসতে পারে। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি ওরা কী জানাতে চাইছে। খবরটা পেয়ে আমি আনন্দিতই হলাম। জাহাজ ধ্বংস হবার পর নৌকায় উঠে টুপিটা মাথায় ভালো করে বসিয়ে দিয়ে আটকে দিয়েছিলাম। নৌকোতে তো প্রচুর ধকল গেছে, দড়িটা কোনো সময়ে ছিঁড়ে গেছে। তারপর আমি দ্বীপে অবতরণ করে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন কোনো এক সময়ে টুপিটা আমার মাথা থেকে খুলে পড়ে গিয়ে হয়তো বাতাসে দূরে কোথাও ছিটকে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম সমুদ্রে সাঁতার দেবার সময় টুপিটা হয়তো আমার মাথা থেকে খসে গেছে। আমি সম্রাটকে অনুরোধ করলাম যত শীঘ্র সম্ভব টুপিটা আনিয়ে দিতে। জিনিসটি ও তার ব্যবহার কী তা আমি সম্রাটকে বুঝিয়ে দিলাম। পরদিনই এক দল ঘোড়সওয়ার টুপিটি নিয়ে এল। কিন্তু টুপির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। ওরা টুপির কানায় দুটো বড় বড় ফুটো করেছে। সেই ফুটোয় হুক আটকে দিয়েছে। হুকে দড়ি বেঁধে ঘোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে, তা প্রায় আমাদের আধ মাইলটাক হবে। তবু তো জমি এবড়োথেবড়ো নয়, বেশ মসৃণ বলা যায় তা নইলে টুপির দফা রফা হয়ে যেত।

এই ঘটনার দুদিন পরে। সম্রাট সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ রাজধানীর আশে পাশে ব্যারাকে থাকত। রাজামশাইয়ের কী খেয়াল হল তিনি বাহিনীর সেনাপতিকে আদেশ দিলেন যে পাহাড়-মানুষ তার দুই পা যতদূর সম্ভব ফাঁক করে দাঁড়াবে

সৈন্যবাহিনী পতাকা উড়িয়ে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে সেই দুই পায়ের তলা দিয়ে মার্চ করে যাবে। সেনাপতি সমরবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং আমার অনুরক্ত। আদেশ পেয়ে সেনাপতি তাঁর বাহিনীকে সাজাতে আরম্ভ করলেন। কোন বাহিনীর পর কোন বাহিনী, পদাতিক কতজন থাকবে, অশ্বারোহীরা পাশাপাশি ক'জন থাকবে, তাদের হাতে পতাকা থাকবে, কোন সুরে ব্যান্ড বাজবে ইত্যাদি সব তিনি সম্পূর্ণ করে ফেললেন। তিন হাজার পদাতিক এবং হাজার অশ্বারাহী কুচকাওয়াজে যোগ দেবে। সম্রাট কঠোর আদেশ জারি করলেন যে সৈন্যরা যেন তাদের শালীনতা ও শোভনতা বজায় রাখে, কেউ যেন আমাকে উপহাস না করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। কিন্তু ছোকরা সৈন্য বা অফিসারদের দোষ দেওয়া যায় না। আমার পরনের ব্রিচেস জোড়ার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল তা দেখে ওদের মধ্যে যে কেউ হাসি সংবরণ নাও করতে পারে। তবে কেউ আমাকে বিদ্রূপ করে নি।

আমি আমার মুক্তি দাবি করে সম্রাটের কাছে বার বার আবেদন করতে লাগলাম। সম্রাট তখন প্রথমে তাঁর মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং পরে জাতীয় প্রতিনিধি মণ্ডলীর পূর্ণ অধিবেশনে আমার মুক্তি প্রসঙ্গটি পেশ করলেন। কেউ আপত্তি করল না। ব্যতিক্রম শুধু স্কাইরেস বলগোলাম। কে জানে কেন বিনা প্ররোচনায় সে আমার দুষমন হয়ে গেল। সে একা কী করবে? আমার মুক্তির বিরুদ্ধে আর কেউ আপত্তি করল না। এবং সম্রাট স্বয়ং আমার মুক্তি সমর্থন করলেন। রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী হলেন গালবেত, অভিজ্ঞ রাজনীতিক। আমার মুক্তির শর্তগুলো তিনি রচনা করলেন অবশ্য স্কাইরেস বলগোলামের দাবিতে। নইলে হয়তো আমার মুক্তির জন্যে কোনো শর্তই আরোপ করা হত না। সেই শর্তগুলো স্কাইরেস স্বয়ং আমার কাছে নিয়ে এল, সঙ্গে এনেছিল দুজন আন্ডার-সেক্রেটারি এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। শর্তগুলো আমাকে পড়ে শুনিয়ে শপথ নিতে বলা হল। শপথ নিতে হবে প্রথমে আমার স্বদেশ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ও পরে লিলিপুটদের দেশের নির্ধারিত আইন মোতাবেক। শপথ নেবার সময় আমাকে বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান পা ধরতে হবে। আমার ডান হাতে মাঝের আঙুল দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করতে হবে আর বুড়ো আঙুলটি রাখতে হবে আমার ডান কানের ডগা ছুঁয়ে। সেই বিচিত্র দেশের জনগণের আচার ব্যবহার ইত্যাদি এবং আমার মুক্তির শর্তগুলো জানবার জন্যে পাঠকদের নিশ্চয় কৌতূহল হচ্ছে। অতএব তাঁদের কৌতূহল নিবারণের জন্যে আমি সেগুলো প্রতিশব্দ অনুসারে যথাসাধ্য অনুবাদ করে প্রকাশ করলাম।

গোলবাস্টো মোমারেন এভলেম গুরডিলো শেফিন মুলি উলি গিউ, লিলিপুটদের সর্বশক্তিমান সম্রাট যিনি বিশ্বের একাধারে আনন্দ ও ভীতি, পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পাঁচ হাজার ব্লুস্টুগ (বার মাইল আন্দাজ পরিধি) ব্যাপী যার সাম্রাজ্য, যিনি রাজার রাজা, মানবপুত্রগণ অপেক্ষা দীর্ঘ, যার পদভারে মেদিনী কাঁপে, যার মস্তক সূর্য স্পর্শ করে এবং যার ঈষৎ অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবীর যে কোনো রাজার জানু কম্পিত হয়, যিনি বসন্তের মতো মনোরম গ্রীষ্মের মতো আরামপ্রদ শরতের মতো ফলপ্রসু কিন্তু শীতের মতো ভয়ংকর এ হেন মহামহিম রাজাধিরাজ সম্রাট আমাদের স্বর্গরাজ্যে সদ্য আগত পাহাড়-মানুষের জন্যে নিম্নোক্ত শর্ত আরোপ করছেন যা তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ নিয়ে কঠোর ভাবে পালন করতে হবে।

এক। আমাদের মহামান্য সম্রাটের পাঞ্জাযুক্ত অনুমতি পত্র ব্যতীত পাহাড়-মানুষ আমাদের রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবে না।

দুই। আমাদের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত যে আমাদের রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং রাজধানীতে আসবার আগে তাকে অন্তত দু ঘণ্টার সতর্কতামূলক নোটিস দিতে হবে যাতে নগরবাসীরা নিজ নিজ আবাসে আশ্রয় নিতে পারে।

তিন। উক্ত পাহাড়-মানুষ কেবলমাত্র নগরের বড় রাস্তা দিয়েই চলবে এবং কখনো মাঠ বা শস্যক্ষেতের উপর দিয়ে হাঁটবে না বা সেখানে শয়ন করবে না।

চার। রাস্তা দিয়ে সে যখন হাঁটবে তখন যেন বিশেষভাবে নজর রাখে যাতে সে আমার প্রিয় কোনো নাগরিক ও তাদের ঘোড়া বা গাড়ি পদদলিত না করে ফেলে এবং রাজি না হলে কোনো নাগরিককে যেন নিজের হাতে তুলে না নেয়।

পাঁচ। জরুরি প্রয়োজন হলে পাহাড়-মানুষ জরুরি বার্তা বহনের জন্যে অশ্বসমেত অশ্বারোহী দূতকে তার পকেটে বহন করে নিরাপদে নিয়ে যাবে এবং প্রয়োজন হলে নিরাপদে সম্রাটের কাছে ফিরিয়ে আনবে। এ কাজ তাকে করতে হবে যে কোনো এক চন্দ্রের ছ'দিন।

ছয়। ব্লেফুসকু দ্বীপবাসীরা আমাদের শত্রু, তারা আমাদের আক্রমণ করবার তোড়জোড় করছে। যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে পাহাড়-মানুষকে আমাদের মিত্র হতে হবে এবং ওদের নৌবহর ধ্বংস করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

সাত। উক্ত পাহাড়-মানুষ তার অবসর সময়ে আমাদের শ্রমিকদের সাহায্য করবে। আমাদের প্রধান পার্কটির দেওয়াল গাঁথবার জন্যে অথবা কোনো রাজপ্রাসাদ তৈরি করার সময় ভারী ভারী পাথরও তাকে তুলে দিতে হবে।

আট। উক্ত পাহাড়-মানুষ দুই চাঁদ সময়ের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রটা পায়ে হেঁটে ঘুরে এসে তার মাপ দাখিল করবে।

সর্বশেষে আমরা বিশ্বাস করি উক্ত পাহাড়-মানুষ এই শপথ গ্রহণ করবে এবং শর্তগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। এজন্যে তাকে প্রতিদিন আমাদের ১৭২৮ জনের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত মাংস ও পানীয় সরবরাহ করা হবে। আমাদের রাজপুরুষদের কাছে সে যেতে পারবে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও তাকে দেওয়া হবে। আমাদের শাসনের একানব্বইতম চন্দ্রের দ্বাদশ দিবসে বেলফ্যাবোরাক প্রাসাদে এই চুক্তি সম্পাদিত হল।

আমি শপথ গ্রহণ করলাম এবং শর্তগুলো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিলাম। যদিও কয়েকটা শর্ত আমার পক্ষে সম্মানজনক ছিল না। সেই শর্তগুলো নৌবহরের প্রধান স্কাইরেস বেলগোলাম আমার প্রতি হিংসাবশে আরোপ করতে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। শপথ গ্রহণ এবং শর্ত মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শেকল খুলে দেওয়া হল। এবং আমি মুক্ত হলাম। আমি স্বাধীন। এই অনুষ্ঠানের পুরো সময় সম্রাট আমার কাছে ছিলেন। আমি তাঁর পদতলে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি আমাকে উঠতে আদেশ করলেন এবং তারপর অনুগ্রহ করে আমার প্রতি যেসব প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলেন তার পুনরাবৃত্তি করলে আমার অহংকার প্রকাশ করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে আমি তাঁর উপযুক্ত ভৃত্য হব এবং আমার প্রতি যে আনুকূল্য দেখানো হয়েছে ও ভবিষ্যতে দেখানো হবে আমি তার মর্যাদা রাখব।

পাঠক বোধহয় লক্ষ করেছেন যে আমার মুক্তিদান উপলক্ষে আমার শেষ শর্তে সম্রাট অনুগ্রহ করে আমার জন্যে যে খাদ্য ও পানীয় বরাদ্দ করেছেন তা ১৭২৮ জন লিলিপুটবাসীর উপযুক্ত। কিছুদিন পরে রাজপরিষদে আমার এক বন্ধুকে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে তারা ঠিক কী করে ১৭২৮ জনের হিসাব করলেন, অনুমানিক নয় একেবারে যথার্থ সংখ্যা।

উত্তরে আমার সেই বন্ধু বললেন যে সম্রাটের গাণিতিকরা কোয়াড্রান্টের সাহায্যে আমার দেহটা মেপে নিয়ে তাদের নিজের একজন মানুষের দেহের তুলনা করেছে এবং সেই অনুপাতে তারা হিসেব করে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অতএব এই হিসেব থেকেই পাঠক লিলিপুটবাসীদের মেধা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[লিলিপুটদের প্রধান নগর মিলডেনডো এবং সম্রাটের প্রাসাদের বর্ণনা। প্রথম সারির একজন মুখ্য সচিবের সঙ্গে লেখকের বাক্যালাপ এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। যুদ্ধের সময় লেখক কর্তৃক সম্রাটের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি।]

স্বাধীনতা লাভের পর আমি সম্রাটের কাছে যে অনুরোধ করলাম তা হল যে আমি মিলডেনডো নগরটি দেখতে চাই। সম্রাট আমার অনুরোধ মঞ্জুর করলেন কিন্তু বললেন, সাবধান, কোনো নাগরিক বা তার বাড়ির যেন কোনো ক্ষতি করো না। আমি নগর দেখতে যাব এ কথা ঘোষণা করা হল। সে দেওয়াল নগরটি ঘিরে রেখেছে তার উচ্চতা আড়াই ফুট এবং অন্তত এগার ইঞ্চি চওড়া। একটা ঘোড়ার গাড়ি স্বচ্ছন্দে দেওয়ালের উপর দিয়ে যেতে পারে। দেওয়ালের উপর দশফুট অন্তর একটা মজবুত টাওয়ার আছে। পশ্চিম দিকের বড় ফটক আমি ডিঙিয়েই পার হলাম। আমি কোট খুলে রেখে শুধু ওয়েস্ট কোট পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম কারণ আমার আশঙ্কা ছিল যে কোটের প্রান্তের আঘাত লেগে বাড়ি অথবা শহরের রমণীদের ক্ষতি হতে পারে। আমি নিচের দিকে ভালো করে নজর রেখে সাবধানে পা ফেলতে লাগলাম, সর্বদা ভয় কাউকে না মাড়িয়ে ফেলি। যদিও আদেশ জারি হয়েছিল যে আমি যখন শহর ভ্রমণে যাব তখন কোনো মানুষ হয়তো কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রাস্তায় চলে আসতে পারে। বারান্দা, ছাদ ও জানালাগুলো কৌতূহলী দর্শকের সমাবেশে পরিপূর্ণ। কৌতূহলী দর্শকের এমন ভিড় আমি দেখি নি। শহরটি একটি সমচতুষ্কোণ, প্রতিদিকের দেওয়াল পাঁচশ ফুট দীর্ঘ। প্রধান দুটি রাস্তা যা পরস্পরকে ছেদ করেছে সে দুটি পাঁচ ফুট চওড়া। ছোটো রাস্তা বা গলির ভিতর আমি ঢুকতে পারি নি, সেগুলো বার থেকে আঠার ইঞ্চি চওড়া। শহরটির জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। বাড়িগুলো তিন থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঁচু। দোকান বাজার বেশ রমরমা।

শহরের কেন্দ্রে যেখানে প্রধান রাস্তা দুটি পরস্পরকে ছেদ করেছে সেইখানে সম্রাটের প্রাসাদ। মূল প্রাসাদ থেকে কুড়ি ফুট দূরে দু'ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে প্রাসাদটি ঘেরা। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। ভিতরে

প্রশস্ত জায়গা থাকায় আমি ঘুরে ঘুরে সমস্ত প্রাসাদটি দেখলাম। প্রাসাদের বাইরের উঠোনটির চারদিক চল্লিশ ফুট। এ ছাড়া আরো উঠোন রয়েছে। রাজকীয় কক্ষগুলো ভিতরের দিকে। সেগুলো দেখবার জন্যে ভিতরে যাওয়া দুঃসাধ্য। উঠোনগুলো ঘিরে যে পাঁচিল বা ফটক রয়েছে তা মাত্র আঠার ইঞ্চি উঁচু এবং সাত ইঞ্চি চওড়া। ওগুলো সহজে অতিক্রম করতে পারলেও ওপারে পা রাখার জায়গা নেই কারণ সেখানে অন্য বাড়ি আছে যেটি পাঁচ ফুট উঁচু। বাড়িটি আমার পক্ষে ডিঙানো সম্ভব নয়। তাছাড়া এই বাড়ির দেওয়াল ও গঠন বেশ মজবুত হলেও ডিঙোবার চেষ্টা করলে আমার পায়ের আঘাতে তার ক্ষতি হতে পারে। অথচ সম্রাটের ইচ্ছে যে আমি তাঁর প্রাসাদের আড়ম্বর দর্শন করি। এজন্যে আমাকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই তিন দিনের মধ্যে আমি একটা কাজ করলাম। শহর থেকে একশ গজ দূরে রাজার বাগান থেকে আমার ছুরি দিয়ে কয়েকটা বেশ বড় বড় গাছ কেটে নিলাম। সেই সব গাছ থেকে আমি দুটো টুল বানালাম, প্রতিটা টুল তিন ফুট উঁচু এবং বেশ মজবুত, আমার ভার সইতে পারবে। নগরবাসীদের আর একবার নোটিশ দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হল যে আমি প্রাসাদের দিকে যাচ্ছি। টুল দুটো হাতে নিয়ে আমি প্রাসাদের ছাদ পার করে ওধারের উঠোনে রাখলাম। এই উঠোনটা আট ফুট চওড়া। আমি তখন এধারের টুলে একটা পা রেখে ছাদ ডিঙিয়ে ওধারের টুলে অপর পা রেখে প্রাসাদ সহজেই পার হলাম। ওধারের উঠোনে নেমে একটা আঁকশির সাহায্যে এধার থেকে টুলটা তুলে আনলাম। ভিতরের এই উঠোনে আমি শুয়ে পড়ে প্রাসাদের মাঝের তলার জানালা দিয়ে প্রাসাদের ভিতর দেখতে পেলাম। আমি যাতে দেখতে পাই এজন্যে ভিতরের জানালাগুলো খোলা ছিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে আমি প্রাসাদের জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হলাম। সম্রাজ্ঞী ও রাজকুমারদের দেখলাম, তাঁরা নিজ নিজ আবাসে রয়েছেন, সঙ্গে সেবক সেবিকা। সম্রাজ্ঞী আমাকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। এবং চুম্বন করবার জন্যে অনুগ্রহ করে জানালা দিয়ে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

রাজপ্রাসাদের অন্যান্য বিবরণী আমি আপাতত দিতে পারছি না, সে আমি পরে হয়তো বিস্তারিতভাবে জানাব। আপাতত আমি যে কাজটি সম্পন্ন করছি তা হল এই সাম্রাজ্যটির সাধারণ বিবরণ; সাম্রাজ্য কীভাবে গঠিত হল, কতজন রাজা শাসন করলেন, তাদের যুদ্ধ ও রাজনীতির বিবরণ, আইনকানুন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্ম, দেশের গাছপালা, জীবজন্তু, দেশের মানুষের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, আমার দৃষ্টিতে তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আমি লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলাম।

আমি লিলিপুটদের রাজ্যে প্রায় নয় মাস ছিলাম। সেই সময়ে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাও আমি লিখে রেখেছি।

আমি মুক্তি পাবার প্রায় একপক্ষ পরে ব্যক্তিগত ব্যাপার সমূহের মুখ্যসচিব (তাঁকে এই পদমর্যাদাই দেওয়া হয়েছে) রেলড্রেসাল একজন মাত্র ভৃত্য নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। তাঁর গাড়িটা তিনি কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন এবং আমাকে বললেন তাঁকে এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলাম কারণ লোকটির ব্যক্তিগত অনেক সদগুণ আছে এবং তিনি আমার অনেক উপকার করেছেন। আমি শুয়ে পড়তে চাইলাম যাতে তিনি আমার কানের কাছে আসতে পারেন, তাহলে তাঁর কথাগুলো আমি

ভালোভাবে শুনতে পাব। কিন্তু তিনি বললেন তার চেয়ে আমি তাঁকে আমার হাতে তুলে নিলে ভালো হয়, তাতে তাঁর কথা বলা সুবিধে হবে। আমি মুক্তিলাভ করায় তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার মুক্তিলাভের ব্যাপারে তাঁরও যে কিছু অবদান আছে সেকথাও সবিনয়ে জানালেন। তিনি আরো বললেন যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা কিছু জটিল নচেৎ আমাকে নাকি এত শীঘ্র ও সহজে মুক্তি দেওয়া হত না। বর্তমানে দেশে দুটি চরম সংকট দেখা দিয়েছে। একটি হল অভ্যন্তরীণ আর অপরটি হল দেশ আজ এক প্রবল শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করছে; শীঘ্রই যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হলে সত্তর চাঁদ পিছিয়ে যেতে হবে। তখনি শুরু। ট্র্যামেকসান এবং স্ল্যামেকসান নাম দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিবাদের তখনি শুরু। দু'দলই ক্ষমতা দখল করতে চায়। জুতোর গোড়ালির উচ্চতার তফাত অনুসারে দল দুটি পরিচিত।

এই রকম বলা হয় যে উঁচু গোড়ালি বা হাই হিল পার্টি দেশের প্রাচীন সংবিধানে বিশ্বাস। কিন্তু সম্রাট লো-হিল পার্টির প্রতি অনুরাগী এবং রাজসভায় মন্ত্রণা পরিষদে ও বিভিন্ন দফতরে তিনি লো-হিল পার্টির প্রভাব অনুমোদন করেন কারণ সম্রাটের রাজকীয় জুতোর গোড়ালি তাঁর সভাসদ অপেক্ষা এক ড্রুর (এক ড্রুর হল এক ইঞ্চির চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ) নিচু। বর্তমানে এই দুই পার্টির মধ্যে মনোমালিন্য এমন সীমায় পৌঁছেছে যে ওরা একত্রে আহার ও পান করে না এমন কি পরস্পরের সঙ্গে কথাও বলে না। হাই হিল বা ট্র্যামেকসান পার্টি, দলে ভারী কিন্তু মূল ক্ষমতা পুরোপুরি আমাদের হাতে। আমরা আশঙ্কা করছি যে রাজমুকুটের মহামহিম উত্তরাধিকারী হাই-হিল পার্টির দিকে ঝুঁকছেন কারণ তাঁর এক পায়ের জুতোর একটি গোড়ালি কিছু উঁচু যে জন্যে তিনি ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটেন। এই অশান্তির জন্যে আমরা বিব্রত ও চিন্তিত, কারণ আমরা অপর দ্বীপ ব্লেফুসকু থেকে আক্রমণ আশঙ্কা করছি। ঐ রাজ্যটিও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ, ক্ষমতায় আমাদের মহামান্য সম্রাটের সমতুল এবং আকারেও প্রায় আমাদের সমান। আমরা তোমার মুখেই শুনেছি যে এই পৃথিবীতে আরো অনেক সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্র আছে যেখানে তোমার মতো দীর্ঘকায় মানুষ বাস করে কিন্তু আমাদের পণ্ডিতদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁরা অনুমান করেন যে তুমি চাঁদ বা কোনো নক্ষত্র থেকে পড়ে গেছ কারণ এই পৃথিবীতে তোমার মতো একশটা মানুষ থাকলেই তারা আমাদের সম্রাটের রাজত্বের সমস্ত ফল ও গবাদি পশু অতি অল্প সময়ে হজম করে ফেলবে। তাছাড়া আমাদের ছ'হাজার চাঁদের ইতিহাসে আমরা লিলিপুট এবং ব্লেফুসকু, এই দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনো সাম্রাজ্যের উল্লেখ পাই নি। গত বত্রিশ চাঁদ ধরে এই দুই রাষ্ট্রে দুর্দম যুদ্ধ মাঝে মাঝেই চলে আসছে। এইসব যুদ্ধের সূত্রপাত কী করে হল সেই কথাই তোমাকে বলি। দেশে ডিম খাওয়ার একটা প্রাচীন পদ্ধতি ছিল, ডিমের মোটাদিক ভেঙে খাওয়া। কিন্তু বর্তমান সম্রাটের দাদা যখন বালক ছিলেন তখন ডিম খাবার সময় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ডিমের মোটাদিক ভাঙতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলেন, বোধহয় ছুরি দিয়ে ডিম ভাঙছিলেন। তখন তাঁর বাবা এ আদেশ জারি করলেন যে এখন থেকে ডিম খাবার আগে ডিমের সরুদিক ভাঙতে হবে। এই আইনের ফলে দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। আমাদের ইতিহাস বলে এই আইন উপলক্ষ করে প্রজারা ছ'বার বিদ্রোহী হয়েছিল ফলে

একজন সম্রাট তাঁর প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং আর একজন তাঁর মুকুট হারিয়েছিলেন। এই গৃহযুদ্ধে ব্লেফুসকুর রাজারা ইন্ধন যোগাত এবং পরে বিপ্লব দমন করলে বিদ্রোহীরা ঐ দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিত। একটা হিসেবে জানা যায় যে বিভিন্নসময়ে এগার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল তবুও তারা ডিমের সরুদিক ভাঙতে রাজি হয় নি। এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কয়েক শত বই লেখা হয়েছে। 'বিগ-এন্ডিয়ান'দের বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সেই দলের কেউ যাতে চাকরি না পায় সেজন্যে আইন জারি করা হয়েছে।

এইসব গণ্ডগোল চলাকালে ব্লেফুসকুর সম্রাটরা মাঝে মাঝে তাদের রাষ্ট্রদূত মারফত অনুযোগ করত যে আমাদের ধর্মনেতা মহান লুসট্রগ পবিত্র গ্রন্থ ব্রুন্ডেকাল-এ (ওদের 'আলকোরান') যে মূল মতবাদ প্রচার করেছেন তা আমরা ভঙ্গ করছি, ধর্মাচরণে বিভেদ সৃষ্টি করছি এবং মহান ধর্মনেতার অপমান করছি।

কিন্তু এসবই মূল বইয়ের বিষয়টি বিকৃত করে বলা হয়েছে। কারণ বইয়ে শুধু লেখা আছে যে, 'সকল সৎ ব্যক্তি সুবিধামতো দিকে ডিম ভাঙবেন' তাহলে সুবিধামতো দিক কোনটি? আমার ক্ষুদ্র মতে সে বিচারের ভার ডিম ভঙ্গকারীর উপর অথবা প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। এদিকে 'বিগ-এন্ডিয়ান' নির্বাসিতেরা ব্লেফুসকু রাজ্য তথা সম্রাটের কাছ থেকে প্রচুর প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং স্বদেশেও তাদের পার্টি গোপনে তাদের নানাভাবে সাহায্য করছে ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ছত্রিশ চাঁদব্যাপী রক্তাক্ত সংগ্রাম চলতে থাকে। এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা চল্লিশটি বড় যুদ্ধজাহাজ এবং আরো বেশিসংখ্যক ছোটো জাহাজ হারিয়েছি। আমাদের তিরিশ হাজার নাবিক ও সৈন্য মারা গেছে এবং অনুমান করা হয় যে, শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি আরো বেশি হয়েছে। যাহোক বর্তমানে তারা একটা নৌবহর গঠন করেছে এবং আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। আমাদের মহামান্য সম্রাট বাহাদুর তোমার সাহস ও শক্তির উপর প্রচুর আস্থাবান এবং সেজন্যে এই সংকটের সময় তোমার কাছে সবকিছু বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

আমি তখন মুখ্য সচিব মশাইকে বললাম যে সম্রাটের প্রতি আমার কর্তব্য আমি নিশ্চয় পালন করব তবে আমি বিদেশী এবং কোনো দলীয় ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। শুধু সম্রাটের জীবন ও তাঁর রাজ্য বাঁচাবার জন্যে আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যথাসাধ্য করব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[এক অসাধারণ কৌশল-বলে লেখক একটা আক্রমণ প্রতিহত করল। তাকে উচ্চ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হল। ব্লেফুসকুর রাষ্ট্রদূত এসে সন্ধি প্রস্তাব করলেন। দুর্ঘটনাক্রমে সম্রাজ্ঞীর কক্ষে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রাসাদের বাকি অংশ রক্ষা করতে লেখকের কৃতিত্ব।]

ব্লেফুসকু সাম্রাজ্য যে দ্বীপে অবস্থিত সেই দ্বীপটি লিলিপুট দ্বীপের উত্তর পূর্বদিকে। মাঝে আটশত গজ প্রশস্ত একটি প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। ঐ দ্বীপ আমি এখনো দেখি নি এবং পাছে জাহাজ থেকে বা অন্যভাবে শত্রুপক্ষ আমাকে দেখে ফেলে এই ভয়ে আমি সমুদ্রতীরে

যেতাম না। এদেশে আমার আগমনের খবর ওরা এখনো জানে না কারণ যুদ্ধকালে দুইদেশের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগাযোগ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে মৃত্যুদণ্ড। সম্রাট দুই দেশের মধ্যে জাহাজ চলাচল আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের গুপ্তচর খবর এনেছে যে শত্রুপক্ষের পুরো নৌবহর এখন অনুকূল বাতাসের জন্যে বন্দরে অপেক্ষা করছে। কীভাবে আমি শত্রুপক্ষের নৌবহরটা আটক করব তারই একটা পরিকল্পনা সম্রাটের কাছে পেশ করলাম। প্রণালীটির গভীরতা সম্বন্ধে আমি সর্বাধিক অভিজ্ঞ কয়েকজন নাবিকের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। এ পথে তারা বহুবার চলাচল করেছে। তারা আমাকে বলল প্রণালীর মাঝখানটাই সবচেয়ে গভীর। জোয়ারের সময় সত্তর গ্লামগ্লাফ গভীর অর্থাৎ ইউরোপীয় মাপে ছফুট। আর বাকি অংশ বড়জোর পঞ্চাশ গ্লামগ্লাফ। আমি হেঁটে ব্লেফুসকুর উত্তর-পূর্বতীরের দিকে গেলাম এবং পকেট থেকে দূরবীন বার করে একটা ছোটো পাহাড়ের আড়াল থেকে ওদের নৌবহর লক্ষ করতে লাগলাম। দেখলাম যে পঞ্চাশটা যুদ্ধজাহাজ অনেক ছোটো জাহাজ বা নৌকো রয়েছে। আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। আমাকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, সেই আদেশবলে আমি বললাম আমার অনেক মজবুত দড়ি ও লোহার বার চাই। ওরা যে দড়ি আনল তা টুন সুতোর চেয়ে একটু মোটা আর লোহার রডগুলো সুচের মতো লম্বা ও মোটা। আমি তিনখানা করে সুতো নিয়ে পাকিয়ে মোটা করলামআর লোহার রডগুলো বেঁকিয়ে হুক তৈরি করে দড়ির ডগায় বাঁধলাম। তারপর আমি আবার উত্তর-পূর্ব তীরে ফিরে গেলাম। আমার কোট, মোজা ও জুতো খুলে ফেললাম, গায়ে রইল শুধু চামড়ার জার্কিন। জোয়ার আসবার আধঘণ্টা আগে পানিতে নামলাম, মাঝখানে তিরিশ গজ আন্দাজ সাঁতরে পার হয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। আধ ঘণ্টার আগেই আমি ওদের নৌবহরের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমাকে দেখে শত্রুরা এত ভয় পেয়ে গেল যে ওরা জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পারে উঠল। পারে তখন হাজার তিরিশ ক্ষুদে সৈন্য জমায়েত হয়েছে। আমি তখন হুক বাঁধা দড়িগুলো বার করে ছিপ ফেলার মতো সেগুলা পর পর ছুঁড়ে মাছ ধলার মতো করে জাহাজগুলো গাঁথতে লাগলাম। ইতোমধ্যে আমার হাতে ও দেহের অন্য অংশে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে বিঁধছে। খুবই বিরক্তিকর। মুখে যেগুলো বিঁধছিল সেগুলো আমাকে বেগ দিচ্ছিল। আমার ভয় হচ্ছিল চোখে যদি তীর বেঁধে তাহলে অন্ধ হয়ে যাব। কিন্তু চট করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। চশমাজোড়া আমার পকেটেই রয়েছে। সম্রাটের অনুসন্ধানকারীরা আমাকে সার্চ করার সময় সেটা দেখতে পায় নি। আমি সেটা পকেট থেকে বার করে চট করে পরে নিলাম। এবার শত্রুর তীর উপেক্ষা করে সাহস করে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তীর এসে আমার চশমার কাচে আঘাত করল কিন্তু ঐ পর্যন্তই, কোনো ক্ষতি করতে পারল না। জাহাজগুলোতে আমার হুক লাগানো হয়ে গেল, এবার সব দড়ি একত্র করে টান মারলাম কিন্তু জাহাজ নড়ল না। বুঝলাম নোঙ্গর বাঁধা আছে। পকেট থেকে ছুরি বার করে নোঙ্গরের দড়িগুলো কচাকচ করে দিলাম। এদিকে শত শত তীর বর্ষিত হচ্ছে, হাতে ও মুখে তীর বিঁধছে। ভ্রূক্ষেপ না করে এবার সব দড়ি ধরে টান মারতেই জাহাজগুলো বন্দর থেকে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করল এবং পঞ্চাশটা যুদ্ধজাহাজ আমি টানতে টানতে নিয়ে ফিরে চললাম।

ব্লেফুসকুডিয়ানরা প্রথমে আমার মতলব বুঝতে পারে নি। কিন্তু পরে তারা আমার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক ও বিহ্বল হয়ে গেল। তারা আমাকে নোঙরের দড়ি কাটতে দেখেছিল, তখন ভেবেছিল আমি বোধহয় জাহাজগুলোকে এদিক ওদিক ভাসিয়ে দেব। কিংবা জাহাজগুলো ভেঙে দেব। কিন্তু যখন দেখল জাহাজগুলোর কোনো ক্ষতি না করে সেগুলো জড়ো করে আমি টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছি তখন তারা হতাশ হয়ে এমন চেঁচামেচি করতে লাগল যে তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আমি যখন বুঝলাম আর বিপদের সম্ভাবনা নেই তখন আমি থামলাম এবং আমার মুখ ও হাত থেকে বিদ্ধ তীরগুলো পটাপট তুলে ফেললাম। এই দ্বীপে নামবার পর যখন আমি শরাহত হয়েছিলাম তখন লিলিপুটরা আমাকে যে মলম লাগিয়ে দিয়েছিল, এখন আমার কাছে সেই মলম খানিকটা ছিল। আমি তীর লাগা জায়গায় সেই মলম লাগিয়ে দিলাম। ইতোমধ্যে জোয়ার এসে গিয়েছিল তাই আমি প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। জোয়ার কমে গেলে আবার চলতে আরম্ভ করলাম। চশমাটা খুলে পকেটে রাখলাম। জাহাজ বাঁধা দড়িগুলো বেশ করে ধরে জল ভেঙে এগিয়ে চললাম। এবং অবশেষে নিরাপদে লিলিপুটে দেশের রাজবন্দরে পৌছলাম। অভিযানের ফলাফল জানবার জন্যে সম্রাট তার সভাসদদের নিয়ে তীরে আমার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা দেখছিলেন জাহাজের বহর অর্ধচন্দ্রাকার বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু আমাকে তারা দেখতে পাচ্ছে না। তখন আমি এক বুক পানিতে এবং যখন প্রণালীর মাঝখানে গভীরতম জায়গাটিতে এসেছি তখন তো আমার একগলা পানি, শুধু মুণ্ডটি ভাসছে। সম্রাট তখন ভাবছিলেন আমি বুঝি ডুবে গেছি এবং শত্রুপক্ষের জাহাজ সার বেঁধে তাঁদের আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু অবিলম্বে তাঁর ভয় দূর হয়েছিল। ইতোমধ্যে পানির গভীরতা কমে গেছে এবং আমার দেহটাও ক্রমশ জল থেকে ওপরে উঠছে। এইভাবে আমি দ্বীপের কাছে এসে গেলাম এবং ওদের কথাও আমার কানে আসাতে লাগল। আমি তখন জাহাজের দড়ির গুচ্ছ বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বললাম "লিলিপুটের সর্বশক্তিমান মহারাজের জয় হোক।" তীরে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আমাকে যথোচিতভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তৎক্ষণাৎ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'নারডাক' দ্বারা আমাকে ভূষিত করলেন।

এবার সম্রাট আমাকে বললেন যে সুবিধামতো আর একদিন ঐ দ্বীপে গিয়ে শত্রুদের সমস্ত জাহাজ লিলিপুট বন্দরে নিয়ে আসতে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে সম্রাটের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে তিনি চান ব্লেফুসকু দ্বীপটাকে অধিকার করে তাকে তাঁর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করতে। সে প্রদেশ শাসন করবে তাঁরই প্রেরিত এক প্রতিনিধি বা ভাইসরয় এবং তিনি চান বিগ এনডিয়ান নির্বাসিতদের ডিমের সরু দিক ভাঙতে বাধ্য করা ও তাদের ধ্বংস করা। এর ফলে সম্রাট সারা দুনিয়ার সম্রাট হতে পারবেন, কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর এই অভিসন্ধি থেকে নিরত করবার চেষ্টা করলাম। তাঁকে বোঝাতে চাইলাম যে তাহলে ঘোর অবিচার হবে, সুনীতি বলে না এমন ভাবে প্রতিহিংসা নিতে। শেষ পর্যন্ত আমি বেঁকে দাঁড়ালাম এবং স্পষ্টই বললাম যে এক স্বাধীন ও সাহসী জাতিকে এইভাবে ক্রীতদাস করতে চাইলে তার মধ্যে আমি নেই। যখন এই বিষয় নিয়ে মন্ত্রণাসভায় ও রাজপরিষদে আলোচনা হল তখন অধিকাংশ জ্ঞানী ও গুণী মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা আমার অনুকূলেই মত দিলেন।

কিন্তু আমার এই স্পষ্ট ঘোষণা মহামান্য সম্রাটের পরিকল্পনার সহায়ক নয়। তিনি আমার যুক্তি মানতে রাজি নন, ফলে তিনি আমাকে কখনই ক্ষমা করেন নি। মন্ত্রণা পরিষদে তিনি তাঁর মনোভাব সুকৌশলে ব্যক্ত করেছিলেন। আমি পরে শুনেছিলাম পরিষদে আমার সমর্থকরা সম্রাটের মুখের উপর প্রতিবাদ করেন নি, তাঁরা নীরব ছিলেন কিন্তু একদল আমার শত্রু হয়েছিল তারা আমার বিরদ্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। অচিরেই সম্রাট এবং আরো কয়েকজন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন যা মাস দুয়েকের ভেতরেই সোচ্চার হয়ে উঠল এবং আমি প্রায় ধ্বংস হতে যাচ্ছিলাম। বুঝলাম রাজারাজড়াদের যতই সেবা করা যাক তাঁদের মন যুগিয়ে চলতে না পারলে পতন অনিবার্য। যে সেবা বা স্বার্থ ত্যাগ করা হয়েছে তা তখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

ব্লেফুসকু দ্বীপে হানা দেওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে শান্তির বিনীত প্রস্তাব নিয়ে ব্লেফুসকু থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দূত এল। বলাবাহুল্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল এবং পুরোপুরি আমাদের সম্রাটের অনুকূলে। চুক্তির সেসব শর্তের উল্লেখ করে আমি পাঠকদের বিরক্ত করতে চাই না। প্রায় পাঁচশজন উপদেষ্টা সমেত ছ'জন রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন। পরাজিত হলেও তারা এসেছিল সাড়ম্বরে যা তাদের সম্রাটের উপযুক্ত বলতে হবে অথচ ব্যাপারটির গুরুত্ব তারা লঘু করে দেখে নি। তারা রাজার কাছে রাজার মতোই এসেছিল। চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি ওদের কিছু সাহায্য করেছিলাম এবং তারা ব্লেফুসকু ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে একদিন আমার বাড়িতে এল। তারা আমার সাহস ও উদারতার প্রশংসা করল কারণ আমি তো ইচ্ছে করলে ওদের জীবন ও সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি করতে পারতাম কিন্তু তা করি নি। তাদের সম্রাটের তরফ থেকে আমাকে তাদের দ্বীপে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। তারা আমার অসাধারণ শক্তি ও শৌর্যের কথা শুনেছে তার কিছু প্রমাণ দেখাতে বলল। আমি তাদের নিরাশ করলাম না তবে তার বিবরণ জানাবার দরকার মনে করছি না।

তারা অবশ্য আমার শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে অবাকও হল যেমন, সন্তুষ্টও হল তেমনি। আমিও তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের সম্রাটের প্রতি আমার অভিনন্দন জানালাম। আরো জানালাম যে তাদের সম্রাটের বীরত্ব, অনুকম্পা ও সুশাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতির কথা আমি শুনেছি এবং দেশে ফেরার আগে আমি স্বয়ং তাদের দ্বীপে গিয়ে সম্রাটকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আসব। পরবর্তী সময়ে আমাদের সম্রাটের সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ করার সুযোগ হল তখন আমি ব্লেফুসকুডিয়ান সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। সম্রাট অবশ্য দয়া করে আমাকে অনুমতি দিলেন কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে নয়। কারণটা আমাকে তাঁরই একজন সভাসদ জানিয়েছিল। ব্লেফুসকু দ্বীপের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল তারই এক বিকৃত রূপ ফ্লিমন্যাপ এবং বলগোলাম সম্রাটের কাছে পেশ করেছিল। তাতে সে অনেক রং চড়িয়েছিল। তাই সম্রাট আমার প্রতি একটু বিরূপ অথচ আমি বেআইনী কিছু করি নি। এই প্রথম আমি রাজসভার চক্র ও চক্রান্তের কিছু ধারণা করতে শিখলাম।

লক্ষণীয় যে ইউরোপে পাশাপাশি হলেও দুই দেশের মধ্যে যেমন ভাষার তফাত থাকে এবং দুই দেশেই যেমন নিজের ভাষার প্রাচীনত্ব, সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা নিয়ে গৌরব বোধ করে অনুরূপভাবে ব্লেফুসকু ও লিলিপুট দ্বীপের ভাষাও ভিন্ন। লিলিপুটদের ভাষা

শিখলেও আমি ওদের ভাষা জানি না অতএব আমাকে রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলতে হয়েছিল। তবুও আমাদের সম্রাট যুদ্ধে জয়লাভ করার সুবাদে ব্লেফুসকুডিয়ানদের বাধ্য করেছিলেন তাদের পরিচয়পত্র পেশ করতে এবং কথাবার্তা লিলিপুট দ্বীপের ভাষায় চালাতে। ব্যবসা বাণিজ্য নির্বাসিত বা আশ্রয়প্রার্থী ও ভ্রমণ, শিক্ষা ইত্যাদির জন্যে উভয় দ্বীপের লোকজনই অপর দ্বীপে যাওয়া-আসা করত। অবশ্য যুদ্ধের সময় ছাড়া। এই সূত্রে স্থানীয় অধিবাসী, ব্যবসায়ী বা নাবিক, অনেকেই অপর দ্বীপের ভাষা উত্তমরূপেই জানত। সেটা আমি জানতে পারলাম যখন কয়েক সপ্তাহ পরে আমি ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার শত্রুদের চক্রান্ত সত্ত্বেও আমার সে ভ্রমণ উপভোগ্য হয়েছিল। আমি যথাস্থানে তার বিবরণ দেব।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে বন্দীদশা থেকে আমার মুক্তির জন্যে যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল তার কয়েকটি আমার মনঃপূত হয় নি এবং সেগুলো আমার কাছে অপমানজনক ও বশ্যতা স্বীকারের সামিল মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন বাধ্য হয়েই আমাকে শর্তগুলো মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আমি এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'নারডাক' উপাধি দ্বারা ভূষিত। অতএব ঐসব শর্ত নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করা আমার পক্ষে মর্যাদাহানিকর এবং সম্রাটও সেইসব শর্ত নিয়ে আর কথা তোলেন নি, তোলা সম্ভবও ছিল না। যাহোক সম্রাটের উপকার করার আমার একটা সুযোগ এল এবং আমার মতে সে কাজ আমি করেছিলাম তার জন্যে আমি প্রচুর কৃতিত্ব দাবি করতে পারি। একদিন মাঝ রাত্রে আমার দরজার কয়েকশত লিলিপুটের চিৎকারে সহসা আমার ঘুম ভেঙে গেল। আকস্মিক এই গোলমালে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। 'বার্গলাম', 'বার্গলাম' শব্দটা বার বার আমার কানে আসতে লাগল। কয়েকজন মানুষ আমার কানের কাছে এসে বলতে লাগল, শিগগির চল রাজপ্রাসাদে আগুন লেগেছে। একজন দাসী একটা জমাটি উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারই অমনোযোগিতার ফলে আগুন লেগে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে চিৎকার করে বললাম, সবাই সরে যাও, আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও। তারা সরে গেল, আমি প্রাসাদের দিকে ছুটলাম, আকাশে চাঁদ ছিল তাই কাউকে মাড়িয়ে ফেলি নি। প্রাসাদে পৌঁছে দেখলাম ওরা দেওয়ালে মই লাগিয়ে বালতি করে জল তুলে জল ঢালছে। কিন্তু জল আনতে হবে অনেক দূর থেকে। তাছাড়া বালতিগুলোও ছোটো, দর্জিরা সেলাই করবার সময় আঙুলে যে চুট পরে তার চেয়ে বেশি বড় নয়। তবুও তারা যথাসাধ্য করছে কিন্তু আগুনের প্রকোপ ভয়াবহ। ওটুকু পানিতে কিছুই হচ্ছে না। আমার গায়ে কোটটা থাকলে সেটা খুলে চাপা দিলে আগুন নিবে যেত। কিন্তু কোট তো আমি বাসায় রেখে এসেছি, তাড়াতাড়িতে শুধু লেদার জার্কিনটা পরে এসেছি। এদিকে আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, সমস্ত প্রাসাদটাই বুঝি ছারখার হয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় আমার মাথায় এক উপস্থিত বুদ্ধি এসে গেল। গত সন্ধ্যায় আমি 'গ্লিমিগ্রিন' নামেএক অতি সুস্বাদু সুরা প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলাম। ব্লেফুসকুডিয়ানরা এই সুরাকে 'ফ্লুনেক' বলে। এই সুরার একটি দোষ বা গুণ আছে। সেটি হল একটি মূত্রবর্ধক। সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি দীর্ঘসময় মূত্রত্যাগ করি নি অথচ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই আমি তার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। আগুন নেভানোর আর কোনো উপায় না দেখে আমি সেই আগুনের ওপরে প্রবল বেগে মূত্রত্যাগ

করলাম এবং তিন মিনিটের মধ্যেই আগুন নিভে গেল এবং যে প্রাসাদ বহু দিন ধরে ও বহু ব্যয়ে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংস থেকে বেঁচে গেল।

দিনের আলো ফুটে উঠল আমি বাসায় ফিরে এলাম। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে সাহস হল না কারণ প্রাসাদটিকে যেভাবে বাঁচিয়েছিলাম তা শোভন নয়, রাজপ্রাসাদে মূত্রত্যাগ লজ্জাজনক, কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও তো ছিল না। রাজধানীতে রাজার বাসভবনে এ হেন কাজ নিশ্চয়ই আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই মনে কিছু ভয় নিয়েই ফিরে এলাম। যাহোক মহামান্য সম্রাটের দূতের কাছ থেকে একটা বার্তা পেয়ে কিছু আশ্বস্ত হলাম। সম্রাট নাকি আমাকে ক্ষমা করার জন্যে তাঁর বিচার বিভাগকে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু সরকারিভাবে তা পাওয়া যায় নি।

আমি আরো একটা খবর পেলাম যে সম্রাজ্ঞী আমার দুষ্কর্মের জন্যে ঘৃণাভরে প্রাসাদের এক দূর প্রান্তে সরে গেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন তাঁর প্রাসাদের যে অংশ পুড়ে গেছে সে অংশ যেন মেরামত না করা হয়। মেরামত করলেও তিনি সেখানে ফিরে যাবেন না। ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তাঁর প্রিয় পাত্রীদের নাকি বলেছিলেন যে তিনি এর প্রতিকার করবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[লিলিপুটবাসীদের পরিচয়, তাদের শিক্ষা; তাদের আইনকানুন, তাদের রীতিনীতি, শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি। সেদেশে লেখকের জীবনযাপন। জনৈক অভিজাত মহিলাকে দুর্নাম থেকে রক্ষা।]

আমার মতলব ছিল যে সাম্রাজ্যের প্রবন্ধকার বিশেষ এবং আলাদা একটা রচনা লিখব। কিন্তু পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে আমি দ্বীপের একটা সাধারণ পরিচয় দেব। দ্বীপবাসীদের গড় উচ্চতা মোটামুটি ছইঞ্চির নিচে এবং জীবজন্তু, পশু পাখি ও গাছপালার আকারও সেই অনুসারে। উদারহরণ স্বরূপ সবচেয়ে বড় ঘোড়া বা বলদ উচ্চতায় চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি, ভেড়া দেড় ইঞ্চি, কম বা বেশি। হাঁসগুলো আমাদের দেশের চড় ই পাখির চেয়ে ছোটো। ছোটো প্রাণীগুলো এইভাবেই ক্রমশ ছোটো হয়েছে। পোকামাকড় তো আমার চোখেই পড়ে না, সেগুলো এতই ছোটো যে আমার দৃষ্টির বাইরে। কিন্তু প্রকৃতি লিলিপুটিয়ানদের দৃষ্টিও সেই রকম করেছে। তারা ছোটো ছোটো জিনিসও ভালোই দেখতে পায় এবং নিখুঁতভাবে। তবে বেশি দূরে তারা দেখতে পায় না। তাদের দৃষ্টি কেমন প্রখর তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন এক বাবুর্চিকে দেখলাম কোথা থেকে একটা লার্ক পাখি বার করল যেটা একটা মাছির মতো ছোটো, আর একদিন দেখি একটি তরুণী সেলাই করছে কিন্তু তার সুচ ও সুতো. দুইই আমার কাছে অদৃশ্য। তাদের সবচেয়ে উঁচু গাছ সাত ফুট লম্বা। রাজার বাগানে যেসব লম্বা গাছগুলো আছে আমি মুঠো করে হাত তুললেও তাদের স্পর্শ করতে পারি। শাকসবজিও সেই মাপ মতো। পাঠক তাদের আকার কল্পনা করে নেবেন।

আমি তাদের শিক্ষা ও পড়াশোনা সম্বন্ধে এখন বিশেষ কিছু বলব না তবে প্রায় সব বিষয়েই তাদের বিদ্যা কয়েক যুগ ধরে বিকশিত হয়েছে। তাদের হাতের লেখার পদ্ধতি

বড়ই অদ্ভুত। তা ইউরোপীয়দের মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নয় বা আরবীয়দের মতো ডান দিক থেকে বাঁ দিকেও নয়। চৈনিকদের মতো উপর থেকে নিচে নয় বা কাসকাজিয়ানদের মতো তলা থেকে উপর দিকে নয়। ইংল্যান্ডের অনেক মহিলার মতো ওরা কাগজের কোনাকুনি লেখে।

মৃতদেহ কবর দেবার সময় মাথা রাখে নিচের দিকে এবং পা উপর দিকে। তাদের মতে এগার হাজার চাঁদ পরে তারা আবার কবর থেকে উঠে আসবে। তারা মনে করে পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং এইএগার হাজার চাঁদের মধ্যে পৃথিবী উল্টে যাবে। তখন মৃতরা পুনর্জীবন লাভ করবে এবং তাদের মাথা উপর দিকে হয়ে যাবে। তারা তাদের নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে। এদের মধ্যে যারা পণ্ডিত তারা এই মতবাদে বিশ্বাস করে না; বলে এ অসম্ভব। তথাপি প্রচলিত প্রথা কেউ অমান্য করে না। এই রাজ্যে এমন কিছু আইন ও প্রথা আছে যা অতি অদ্ভুত। এইসব আইন ও প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আইন ও প্রথা সমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহলেও এদের যুক্তি আছে। তবুও কথা হচ্ছে এগুলো ওরা মেনে চলে কিনা। প্রথম উদাহরণটি আমি দেব গুপ্তচরদের সম্বন্ধে। এদেশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোনো অপরাধের জন্যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিচারের সময় নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারলে, যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল তাকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর খালাস পাওয়া আসামী যেহেতু তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পেরেছে তখন অর্থ ও সময় অপচয়ের জন্যে; যে বিপদের ঝুঁকি তাকে নিতে হয়েছিল, কারাগারে অযথা তাকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এবং তাকে আত্ম-সমর্থনের সময় যে মনোকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এ সবের জন্যে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় চারগুণ। এই ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ ও সম্পত্তি আসে কোথা থেকে? যে ব্যক্তি অভিযোগ করেছিল এবং যার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে তার ধনসম্পত্তি থেকে। কিন্তু সে ব্যক্তির যদি যথেষ্ট পরিমাণে ধনসম্পত্তি না থাকে তাহলে রাজকোষ থেকেই সবকিছু মিটিয়ে দেওয়া হয়। সম্রাটও মুক্তি পাওয়া আসামীকে কিছু আনুকূল্য বা সম্মান অর্পণ করেন এবং তার নির্দোষিতা সারা শহরে প্রচার করা হয়।

চুরি অপেক্ষা জাল জুয়াচুরিকে তারা বড় অপরাধ মনে করে এবং এজন্যে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। তারা বলে সাবধান হলে এবং নিজের জিনিসের উপর নজর রাখলে চোর চুরি করতে পারে না কিন্তু ঠক ব্যক্তি পরের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে বিপদে ফেলে। ঠক ব্যক্তি সততা ভঙ্গ করে। জিনিস বেচাকেনার সময় অসাধু ব্যবসায়ী যদি নির্দোষ ব্যক্তিদের ঠকাতে থাকে তাহলে সেই অসাধু ব্যবসায়ীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং তাকে রোধ করবার জন্যে যদি কোনো আইন না থাকে তাহলে এই অসাধুতা বাড়তেই থাকবে এবং নির্দোষ ব্যক্তি চোরের শিকার হবে। আমার মনে পড়ছে আমি একবার অপরাধীর জন্যে সম্রাটের কাছে মধ্যস্থতা করেছিলাম। লোকটির কাছে তার মনিব বেশ কিছু অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল কিন্তু লোকটি সেই অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়। লোকটির পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম লোকটি শুধু বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। বিশ্বাসভঙ্গ বলে আমি যে লোকটিকে চরম দণ্ডের সামনে ফেলে দিলাম তা আমি বুঝতে পারি নি। তবে বুঝলাম বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রথা-অপরাধের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব ভিন্ন হতে পারে।

প্রত্যেক সরকারের পুরস্কার ও তিরস্কার অথবা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে তবে তা

সর্বদা প্রয়োগ করা হয় না। তিরস্কার বা শাস্তিদানে সরকার অনেক ক্ষেত্রে উদার কিন্তু পুরস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুদার। একমাত্র লিলিপুটিয়ানদের দেখলাম তারা আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে। যদি কোনো ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারে যে সে তিয়াত্তরটি চাঁদ ধরে দেশের আইন শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলেছে তাহলে তার প্রচলিত জীবনধারা ও ব্যক্তিগত গুণানুসারে তাকে নির্দিষ্ট একটি তহবিল থেকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয় বা সে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। এছাড়া তাদের 'স্নিলপল' বা 'আইনমান্যকারী' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। তবে এই উপাধি ওরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করতে পারে না। আমি যখন ওদের বলতাম যে আমাদের ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে শাস্তির বিধান আছে কিন্তু পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই ওরা অবাক হত। ওরা বলল ওদের বিচারালয়ে তাদের ন্যায়দেবীর ছটি চোখ আছে, দুটি সামনে, দুটি পিছনে আর দুটি দুপাশে। তিনি সব দিক দেখেন, তাঁর ডান হাতে আছে এক থলি সোনার মোহর আর বাঁ হাতে খাপেভরা তলোয়ার, শাস্তি অপেক্ষা পুরস্কারের ব্যবস্থাই অধিক।

চাকরিতে নিয়োগের জন্যে যোগ্যতা অথবা প্রার্থীর নৈতিক চরিত্র ও সততার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারা বলে জনগণের জন্যেই সরকার, সেখানে জটিলতার কোনো স্থান নেই। জনগণ যেন সরকারি কাজকর্ম সহজ ও সরলভাবে বুঝতে পারে। অতি বুদ্ধিমান লোক নিযুক্ত করলে এবং তারা কোনো দোষ করলে তারা সেই দোষ ঢাকবার জন্যে চতুরতার আশ্রয় নেয়। কারণ সে বুদ্ধি তার আছে কিন্তু সরল একজন কর্মী দোষ করলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও কম যোগ্য কর্মী অপেক্ষা এই সরল মানুষকে বোঝা অনেক সহজ হয় এবং সে কাজে যে ভুল করেছে তা স্বীকার করার ফলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ে না, সমাধান সহজ হয়।

অনুরূপভাবে এরা ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষকে চাকরির জন্যে মনোনীত করে কারণ তাদের সম্রাট ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে বিশ্বাসী নয় সে সম্রাটেরও বিশ্বাসভাজন হতে পারে না।

এইজন্যে এখানে চাকরিতে নিয়োগের জন্যে ক্রীড়াকৌশলে দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেখানে কোনো কারচুপি করার সুযোগ নেই। এই পরীক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সম্রাটের ঠাকুর্দা প্রচলন করেছিলেন।

অকৃতজ্ঞতা এদের দৃষ্টিতে মস্ত অপরাধ। তার যে উপকার করে সে উপকার সে যদি স্বীকার না করে তাহলে সে মনুষ্যজাতির শত্রু এবং এমন ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

লিলিপুটদের দেশে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য অথবা সন্তানদের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরস্পরের সম্পর্ক ওরা অন্য দৃষ্টিতে দেখে। ওরা বলে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে পশুর মতো মানুষেরও সন্তান জন্মায়। সন্তান তার অজান্তেই পৃথিবীতে এসেছে অতএব পিতামাতার প্রতি তার কোনো দায়দায়িত্ব না-ও থাকতে পারে। সেরকমই সন্তানদের শিক্ষার ভারও পিতামাতার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এই জন্যে প্রতি শহরে সাধারণের জন্যে নার্সারি স্কুল আছে। বাচ্চার বয়স যেই কুড়ি চাঁদ হবে কারণ সেই বয়সে শিশুদের কিছু জ্ঞানগম্যি হয়, তখন কুটিরবাসী ও শ্রমিক ব্যতীত প্রত্যেক বাপ মাকে তাদের ছেলেমেয়েদের নার্সারি স্কুলে পাঠাতে হবে। সেখানে

তারা প্রতিপালিত হবে ও লেখাপড়া শিখবে। ছেলে ও মেয়েদের গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে এই সব নার্সারি স্কুল কয়েক রকমের করা হয়েছে। এই সকল স্কুলে নানা গুণের যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা আছে। তারা বাপ মায়ের বিত্ত ও পদমর্যাদা অনুসারে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলে। অবশ্য শিশুরা কতখানি নিতে পারবে সেদিকে নজর রাখা হয়, জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। আমি প্রথমে ছেলেদের নার্সারির কিছু কথা বলব তারপর মেয়েদের নার্সারির বিষয়।

ধনী ও অভিজাত পরিবারের ছেলেদের নার্সারি গুলোতে রাশভারী পণ্ডিত এবং যোগ্য সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত আছে। শিশুদের আহার ও পোশাক সাধারণ। সম্মান ও সততা, ন্যায়বিচার, সাহস, শালীনতা, দয়া, ধর্ম ও দেশের প্রতি প্রেম ও আনুগত্যের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে এবং তাদের সেই ভাবেই গড়ে তোলা হয়। আহার নিদ্রার অল্প সময় ব্যতীত ছাত্রদের কোনো না কোনো কাজে লিপ্ত রাখা হয়। তবে এর মধ্যে দুঘণ্টা খেলবার সময়। সেই সময়ে দৈহিক ব্যায়ামও করতে হয়। চার বছর বয়স পর্যন্ত তাদের জামাকাপড় পরিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু তারপর নিজেদের পোশাক নিজেকেই পরতে হয়, তারা যে পরিবারের ছেলে হোক না কেন। কিছু বয়স্ক নারী কর্মী আছে। তাদের বয়স আমাদের পঞ্চাশ বছর বয়সের সমান। এই নারী কর্মীদের ঘরদোর সাফ, বাসন মাজা, ঝাড় পোঁছ ইত্যাদি কাজ করতে হয়। ছাত্রদের কখনো ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না। সেজন্যে অশিক্ষিত লোক মারফত কুশিক্ষার পাবার সুযোগ পায় না। ছোটো থেকে বড় বা বড় থেকে ছোটো নার্সারিতে বা খেলাঘরে, মাঠে যাবার সময় সর্বদা সঙ্গে শিক্ষক বা তাঁর সহকারী সঙ্গে থাকেন। বাপ-মাকে বছরে দুবার তাদের ছেলেকে দেখতে দেওয়া হয় তাও এক ঘণ্টার বেশি নয়। শিক্ষক সে সময় উপস্থিত থাকেন এবং ফিসফিস করে বা গোপনে কোনো কথা বলা তখন নিষেধ। খেলনা, টফি চকলেট বা কোনো উপহার আনা নিষিদ্ধ। এমন কি আদর করাও নিষেধ তবে প্রথম সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময় বাপ-মা ছেলেকে চুম্বন করতে পারে।

ছেলেদের শিক্ষার ও তাকে খুশি রাখার যাবতীয় খরচ বাপ মাকে দিতে হয় এবং সেই খরচ আদায় করার ভার সরকারের।

সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, বৃত্তিধারী, পেশাজীবী এবং কারিগরদের ছেলেদের নার্সারিগুলোতে তুল্যমূল্যভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু যেসব ছাত্র পিতার বা অন্য কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করবে তাদের সাত বছর বয়স হলে শিক্ষানবিশি করতে দেওয়া হয়। যারা একটু উচ্চশ্রেণীর তাদের ছেলেদের পনের বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের একুশ বছর বয়সের সমান পর্যন্ত শিক্ষানবিশ থাকতে হয় তবে সাধারণত শেষ তিন বছর ক্রমশ শিথিল করাও হয়।

বড়ঘরের মেয়েদের নার্সারির ব্যবস্থা ছেলেদের নার্সারির মতো। তবে মেয়েদের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষক বা সহকারী শিক্ষকের উপস্থিতিতে দাসী তাদের জামাকাপড় পরিয়ে দেয় কিন্তু পাঁচ বছর পার হলেই মেয়েরা নিজেদের পোশাক নিজেরাই পরে। কিন্তু এইসব দাসী বা নার্স যদি কখনো মেয়েদের কাছে কোনো বাজে গল্প করে বা কুশিক্ষা দেয় তাহলে তাদের শহরে প্রকাশ্যে বেত মারা হয়, এক বছর জেল দেওয়া হয় অথবা দেশের কোনো নির্জন স্থানে চিরজীবনের জন্যে নির্বাসন দেওয়া হয়।

ছেলেদের মতো মেয়েরাও সাহসী হতে শেখে, নির্বোধ হতে লজ্জা পায়। তারা অহেতুক দামি অলংকার পরে না তবে যেটুকু দরকার সেটুকু পরতে দেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমে আমি কোনো তফাত দেখি নি তবে মেয়েদের ব্যায়াম ও খেলা তাদের উপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের ঘর গেরস্থালীর কাজ ও সহবৎ শিখতে হয়।কারণ একদিন তারা বড় হবে, গৃহিণী হবে, স্বামীর পাশে দাঁড়াবে, অতিথিদের আপ্যায়ন করবে। বার বছর বয়স হলে মেয়েদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কারণ তাদের তখন বিয়ের বয়স হয়েছে। যাবার আগে বাপ-মা শিক্ষকদের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যান এবং মেয়েও তার শিক্ষিকা ও বান্ধবীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে চোখের জল ফেলে। নিম্নস্তরের মেয়েদের নার্সারিতে মেয়েদের উপযোগী কাজ শেখানো হয়। যাদের শিক্ষানবিশির জন্যে মনোনীত করা হয় তাদের সাত বছর বয়েসে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর বাকি মেয়েদের এগার বছর বয়স পর্যন্ত রাখা হয়।

নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের জন্যে নার্সারিতে তাদেরও বাপ-মাকে বছরে একবার টাকা দিতে হয় এবং একটা অংশ নার্সারির স্টুয়ার্ডকে দিতে হয়, তবে পরিমাণ কম। ধনী দরিদ্র সকলকেই তার ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্যে নিয়মিত অর্থ দেওয়া বাধ্যতামূলক। কারণ লিলিপুটিয়ানদের মতে দেশে যত ইচ্ছা সন্তান হবে আর তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্যে রাজকোষ থেকে অর্থ দেওয়া হবে তা চলতে পারে না। ধনী পিতামাতা তাদের সন্তানদের সকল ব্যয় নির্বাহের জন্যে নার্সারিকে বেশি পরিমাণ অর্থ দেয়। শিক্ষাখাতে যে অর্থ আদায় ও ব্যয় করা হয় তার আয় ব্যয়ের হিসেব কঠোর ভাবে রক্ষিত হয়।

কুটিরবাসী ও শ্রমিকদের সন্তানরা নার্সারিতে যায় না কারণ তাদের জন্যে নার্সারি নেই। তারা বাড়িতেই থাকে এবং বড় হলে বাপ মায়ের পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করে। তারা জমি চাষ করে বা অন্য কাজ করে। পুঁথিগত বিদ্যা তাদের কাজে লাগে না। এদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ বা রোগাক্রান্ত হয় তাদের হাসপাতালে আশ্রয় দেওয়া হয় কারণ লিলিপুট দ্বীপে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। ভিক্ষা কী, তারা জানে না।

এবার আমার কথা কিছু বলি। ন'মাস তের দিন আমি দ্বীপে কী করে অতিবাহিত করলাম, কী করে সময় কাটাতাম, কী কাজ করতাম, এ বিষয়ে পাঠকদের কৌতূহল হতে পারে। মাথায় তো নানারকম বুদ্ধি খেলে এবং প্রয়োজনও আছে তাই একদিন রাজার বাগান থেকে কাঠ নিয়ে এসে নিজের জন্যে কাজ চালানো গোছের একটা টেবিল আর চেয়ার তরি করলাম। আমার শার্ট ও বিছানার চাদর তৈরি করবার জন্যে দুশ জন মেয়ে দর্জি নিযুক্ত করা হল। একটা টেবিলক্লথও তৈরি করতে হবে। ওরা যদিও বেশ মোটা ও মজবুত কাপড় এনেছিল তবুও তা আমার পক্ষে খুব পাতলা তাই ওরা কাপড়গুলো তিন পুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, ওদের কাপড়ের থান তিন ইঞ্চি চওড়া আর তিন ফুট লম্বা অতএব সেইসব থান জুড়ে জুড়েও বড় থান তৈরি করতে হল। এবার আমার জামার মাপ নিতে হবে। আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। বেশ মোটা দড়ি নিয়ে একজন দাঁড়াল আমার গলায় আর একজন আমার উরুর উপর। আর একজন একটা মাপবার ফিতে নিয়ে সেই দড়িটা মাপতে লাগল। এইভাবে ওরা শার্টের ঝুলের মাপ নিল। তারপর ওরা আমার বুড়ো আঙুলের ঘেরের মাপ নিল। বুড়ো আঙুলের ডবল মাপ নাকি কব্জির ঘেরের মাপ।

তারা আমার গলা ও কোমরের মাপও নিল। জামাটার প্যাটার্ন কেমন হবে তা বোঝাবার জন্যে আমি আমার পুরানো শার্টখানা জমিতে পেতে দিয়েছিলাম। তারা যে জামা তৈরি করল তা আমার গায়ে ঠিকই হয়েছিল। এরপর আমার কোট ও প্যান্ট তৈরি করতে হবে, সেজন্যে তিনশ দর্জি নিযুক্ত করা হল। আমার মাপ নেবার জন্যে তারা আমাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল তারপর মই লাগিয়ে আমার ঘাড়ে উঠে ওলন দড়ি ফেলে কোটের ঝুলের মাপ নিল। আমি দেখলাম এইভাবে মাপ নিতে ওদের অযথা পরিশ্রম হচ্ছে এবং অসুবিধেও হচ্ছে। তখন আমি ওদের দড়ি দিয়ে আমার হাত, কোমর ইত্যাদির মাপ নিয়ে ওদের বলতে লাগলাম। তারা আমার বাড়ির ভেতর একটা ঘরে বসে আমার কোট প্যান্ট তৈরি করতে লাগল। আমার বাড়িতে কারণ, ওগুলো যত তৈরি হয়ে আসছিল ততই তো মাঝে মাঝে তুলে ধরবার দরকার হচ্ছিল। দেখা দরকার জিনিসটা কেমন হচ্ছে। এভাবে জামা প্যান্ট ওদের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয় তাই মাঝে মাঝে আমাকেও সাহায্য করতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত শার্ট, কোট ও প্যান্ট ভালোই দাঁড়াল।

আমার খাবার তৈরির জন্যে তিনশ বাবুর্চি ও খানসামা নিযুক্ত হয়েছিল। তারা আমার বাড়ির কাছে কুটির তৈরি করে সপরিবারে বাস করত আর আমার জন্যে দুটো পদ রান্না করে দিত। আমি কুড়িজন ওয়েটারকে আমার হাতে করে টেবিলে তুলে দিতাম, খিদমত খাটাবার জন্যে নিচে থাকত একশ জন। তাদের কাছে থাকত সুরার পিপে। ওপরে যারা থাকত তারা টেবিলের কানায় চাকা লাগিয়ে রেখেছিল। ইউরোপে আমরা কুয়ো থেকে যেমন করে জল তুলি ওরা তেমনি চাকার ভেতর দিয়ে দড়ি ঝুলিয়ে দিত। দড়ির প্রান্তে থাকত বালতি। নিচের খিদমতগারেরা পিপে থেকে বালতিতে মদ ঢেলে দিত। ওরা সেই মদ উঠিয়ে নিয়ে টুলে চড়ে আমার গেলাসে ঢেলে দিত। ওদের এক ডিশ মাংস আমি এক গালেই শেষ করতাম আর এক পিপে মদ আমার গলা ভেজাতে পারত, তার বেশি নয়। ওদের মাটনও ভালো তবে খুব ছোটো কিন্তু বিফ-এর টুকরো বড় এবং অতি সুস্বাদু। একবার কোথা থেকে একটা কোমরের টুকরো এনেছিল যেটা আমি এক গ্রাসে খেতে পারি নি, তিনটে টুকরো করতে হয়েছিল, তবে এত বড় টুকরো বিরল। আমরা স্বদেশে যেমন সহজে মুর্গির ঠ্যাং চিবিয়ে খাই এখানে মাংসর সরু সরু হাড়গোড়াগুলো সেভাবে স্বচ্ছন্দে চিবিয়ে খেতে দেখে আমার বাবুর্চি, খানসামা ও ওয়েটাররা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। এছাড়া ওদের বিশ তিরিশটা পাখির মাংস আমি এক গ্রাসেই খেয়ে ফেলতাম। এমন রাক্ষুসে খাওয়া তো ওরা দেখে নি, অবাক হবেই তো!

আমার থাকা ও খাওয়ার খবর সম্রাটের কানে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি স্বচক্ষে তা দেখবার জন্যে একদিন সম্রাজ্ঞী, রাজকুমার ও রাজকুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে আহার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা সকলেই অনুগ্রহ করে এলেন এবং আমি তাঁদের সযত্নে আমার টেবিলের ওপর তুলে নিলাম। রাজবাড়ি থেকে তাঁদের বসবার চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম আনিয়ে আমার টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছিলাম। এই ভোজে সম্রাটের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপও এসেছিল। খাবার সময় আমি লক্ষ করতে লাগলাম যে ফ্লিমন্যাপ আমার দিকে বাঁকা চোখে চাইছে যা আমার ভালো লাগে নি। আমি অবশ্য সেদিন বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। ফ্লিমন্যাপের কিছু একটা মতলব আছে। সম্রাট এই যে আমার

বাড়িতে এলেন এর সুযোগ নিয়ে লোকটা নিশ্চয় সম্রাটের কান ভাঙাবে। আমার বিরুদ্ধে সে কিছু একটা করলে আশ্চর্য হব না। লোকটা স্বভাবগম্ভীর তবুও আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে যদিও সেটা দেঁতো হাসি তথাপি আমি জানি লোকটা আমার দুষমন। আমার অনুমান মিথ্যা নয়। ফ্লিমন্যাপ সম্রাটের কাছে অভিযোগ করেছে যে রাজকোষের অবস্থা ভালো নয়, তাকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হচ্ছে কারণ হলাম আমি। আমাকে পুষতে সম্রাটের ইতোমধ্যেই সাড়ে লক্ষ স্প্রাগ (ওদের সবচেয়ে বড় আকারের স্বর্ণমুদ্রা, ছোটো চুমকির মতো হবে আর কি) খরচ হয়ে গেছে অতএব তার পরামর্শ প্রথম সুযোগেই আমাকে বরখাস্ত করা হোক।

আমার জন্যে একজন নির্দোষ মহিলার কিছু দুর্নাম রটেছিল তবে আমি তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করে আবার তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম। সে কাহিনী এখানে বলা আমি কর্তব্য মনে করছি। রাজসভায় নানা রকম মানুষ থাকে, কারো বদঅভ্যাস পরনিন্দা করা, চুকলি কাটা, অথচ এর দ্বারা তার কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হয় না। এইরকম কোনো এক ব্যক্তি মহা-কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপের মাথায় ঢুকিয়ে দেয় যে তার স্ত্রী আমার প্রতি অনুরক্ত যা একেবারেই অসম্ভব। এই মুখরোচক সংবাদটি মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। মহিলা অবশ্য আমাকে পছন্দ করতেন, আমার বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন তবে কখনো একা বা গোপনে আসেন নি। যখনি এসেছেন তখনি সঙ্গে গাড়িতে এনেছেন অন্তত তিনজনকে, তাঁরা তার বোন ও কন্যা বা অপর কোনো আত্মীয় বা বান্ধবী। ওদেশের অভিজাত পরিবারের মহিলারা এমন দলবেঁধে অনেকের বাড়ি যান। আমার ভৃত্যদের বলা ছিল আমার বাড়ির সামনে কোনো গাড়ি এসে থামলে যেন আগে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়ে ঘোড়া ও গাড়ি সমেত সকলকে তুলে এনে আমার টেবিলে রাখতাম। টেবিলের এক অংশে আমি গোল বেড়া লাগিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম, তার ভেতরে গাড়ি থাকত যাতে পড়ে না যায়। গাড়িতে ছ'টা ঘোড়া থাকলে সহিস দুটো ঘোড়া খুলে দিত, আমি সেদুটোকে পরে তুলে দিতাম। গাড়ি, ঘোড়া, সহিস, কোচোয়ানে আমার টেবিল ভর্তি হয়ে যেত। আমি যখন অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতাম তখন কোচোয়ান কাউকে গাড়িতে চাপিয়ে আমার টেবিলের ওপরেই গাড়ি ছোটাত। অনেক অপরাহ্ণ আমি আমার অতিথিদের সঙ্গে গল্প করে মহানন্দে কাটিয়েছি। এই ডাঁহা মিথ্যা আমার কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম, একজন নির্দোষ মহিলার নামে এমন জঘন্য কলঙ্ক রটনার জন্যে আমি কোষাধ্যক্ষ ও সেই দুজন বাজে লোক, ক্লুস্ট্রিল আর ড্রনলো, যারা এই কলঙ্ক রটিয়েছিল তাদের ওপর অত্যন্ত চটে গেলাম। আমি চ্যালেঞ্জ জানালাম যে তারা প্রমাণ করুক যে কোনো পুরুষ বা মহিলা কখনো আমার কাছে গোপনে বা ছদ্মবেশে এসেছিল কি না। অবশ্য মুখ্য সচিব রেলড্রেসলি একবার সম্রাট কর্তৃক আমার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে ঘটনা আমি আগেই বলেছি। আমি দেশের সর্বোচ্চ 'নারডাক' উপাধিতে ভূষিত অতএব আমিও একজন মানী লোক। সেজন্যেও নয়, আমার জন্যে একজন নির্দোষ মহিলার নামে কুৎসা রটবে এমন ঘটনা সহ্য করা যায় না। কোষাধ্যক্ষ মশাইও উচ্চ সম্মানে সম্মানিত, তিনি 'ক্লামগ্লাম' উপাধি পেয়েছেন কিন্তু তা নারডাক অপেক্ষা এক ডিগ্রি কম। যেমন ইংল্যান্ডে ডিউকের পরে মারকুইসের স্থান।

তথাপি ফ্লিমন্যাপ অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং পদের সুযোগ সে পুরোপুরি গ্রহণ করে বাজে গুজবে বিশ্বাস করে সে শুধু আমাকেই নয়, তার স্ত্রীকেও অবহেলা করেছিল। পরে যদিও সে তার ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছিল কিন্তু আমাকে সে অপদস্থ করতে ছাড়ে নি। সম্রাটও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[লেখক জানতে পারলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং তাঁকে শীঘ্রই অভিযুক্ত করা হবে। তিনি ব্লেফুসকু দ্বীপে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার বিবরণ।]

এই রাজ্য ত্যাগ করার বিবরণ জানাবার পূর্বে আমার বিরুদ্ধে দু'মাস ধরে যে ষড়যন্ত্র চলছিল সে বিষয় পাঠকদের জানানো আমার উচিত।

আমি আমার জীবনে কখনো রাজা বা রাজসভার সংস্পর্শে আসি নি কারণ আমার সে যোগ্যতা ছিল না। আমি একজন বিত্তহীন সাধারণ নাগরিক অতএব রাজসভায় কী করে যেতে পারি? রাজা বা মন্ত্রীদের অনেক কেলেঙ্কারি ও মুখরোচক প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের কাহিনী শুনেছি। তবে এই সব ব্যাপার যে আমাকে সম্পূর্ণ নতুন এক দেশে প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং সেই ভিন্নধর্মী দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে তা আমি কোনোদিন ভাবি নি, কল্পনাও করতে পারি নি। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় ক্ষুদে মানুষদের বিচিত্র দেশ লিলিপুট।

ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাটের আমন্ত্রণে আমি যখন সেই দেশে যাবার তোড়জোড় করছি ঠিক সেই সময়ে রাজসভার একজন দামি ব্যক্তি (ইনি একবার সম্রাটের বিষনজরে পড়েছিলেন, তখন আমি তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম) আমার বাড়িতে গোপনে বন্ধ পালকি চেপে এলেন। বাইরে যে পাহারায় ছিল তাকে বলল আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কিন্তু নাম বলল না।

খবর পেয়ে আমি তখনি বাইরে এলাম এবং এহেন একজন অভিজাত ব্যক্তিকে এত রাত্রে দেখে অবাক হলাম। যাহোক পালকিবাহকদের সরিয়ে দিয়ে আমি সেই অভিজাত ব্যক্তিকে পালকি সমেত আমার কোটের পকেটে ভরে নিলাম এবং আমার একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে বলে দিলাম যে আমার শরীর ভালো নেই, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি, কেউ যেন বিরক্ত না করে। ঘরে ঢুকে বেশ করে দরজা বন্ধ করে মহামান্য অতিথিকে পকেট থেকে বার করে তাঁকে টেবিলে যথারীতি বসিয়ে আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁর পাশে বসলাম। সৌজন্যে বিনিময়ের পর লক্ষ করলাম যে আমার অতিথি বিশেষ ভাবে চিন্তিত। আমি তাঁকে তাঁর এই উৎকণ্ঠার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে তিনি যা বলবেন তা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। কারণ ব্যাপারটির সঙ্গে আমার সম্মান এমন কি আমার জীবনের নিরাপত্তাও জড়িত। তিনি যা বললেন তা শুনে আমি বিস্মিত। তিনি চলে যাবার পর আমি তাঁর কথাগুলো লিখে রেখেছিলাম।

তিনি আমাকে বললেন, আপনাকে জানানো দরকার যে কয়েকজন অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে রীতিমতো সক্রিয় এবং তাঁরা আপনাকে ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প। সম্রাটের কাছে ওরা গুরুতর অভিযোগ করেছে এবং দু'দিন হল সম্রাট কী করবেন তা স্থির করে ফেলেছেন। তিনি লিখিত নির্দেশ জারি করবেন।

আপনি জানেন যে আপনি এখানে আসার প্রায় গোড়া থেকেই স্কাইরিস বলগোলাম (গালবেত অর্থাৎ নৌবহরের প্রধান এ্যাডমিরাল) আপনার সাংঘাতিক শত্রু। এই শত্রুতার ঠিক কী কারণ তা আমি জানি না তবে ব্লেফুসকুতে আপনার অসামান্য সাফল্যের পর আপনার প্রতি ওর ঘৃণা যেন শতগুণ বেড়ে গেছে। হয়তো সে মনে করে এ্যাডমিরাল রূপে তার কৃতিত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে। স্কাইরিস আপনার আর এক শত্রু কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কেউ বা কারা আপনার নামের সঙ্গে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে কলঙ্ক রটিয়েছিল, সেই থেকে ফ্লিমন্যাপ আপনার ওপর খাপ্পা। প্রধান সেনাপতি লিমটক, চেম্বারলেন লালকন এবং বিচারপতি বালমাফ, তিন জন মিলে রাজদ্রোহিতা এবং আরো কিছু সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র জুড়ে আপনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ-পত্র সম্রাটের কাছে পেশ করেছে।

আমি তো জানি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং এসবের কিছুই আমি জানি না। তবুও তিনি যতটুকু বললেন তা শুনে আমি জ্বলে উঠলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শান্ত করলেন। তাঁর তখন ভয় আমি ক্ষেপে গেলে এখনি হয়তো সবকিছু ধ্বংস করে দেব। তিনি বললেন, এক সময়ে আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন সেজন্যে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি আপনাকে সর্তক করে দিতে এসেছি। আপনার বিরুদ্ধে ওরা যে অভিযোগ পত্র তৈরি করেছে তার একটা নকল আমি আপনার জন্যে সংগ্রহ করে এনেছি। আমি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একটি আপনার জন্যে এনেছি, ধরা পড়লে আমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি সেই অভিযোগ পত্রটি ভালো করে পড়লাম। আদালতে উকিল যেভাবে বিচারকের কাছে মামলার আবেদন পত্র পেশ করে বা বিধান সভায় বিধায়করা যেভাবে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পেশ করে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রটিও সেইভাবে রচিত হয়েছে।

কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন (পাহাড়-মানুষ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিভিন্ন ধারা

১ নং ধারা

যেহেতু মহামান্য সম্রাট ক্যালিন ডেফার প্লুন তাঁর রাজ্যে এমন একটি বিধিবদ্ধ আইন প্রচলিত করেছেন যার দ্বারা যে কেউ রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে মূত্রত্যাগ করলে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে এবং দণ্ডনীয় হবে এবং তৎসত্ত্বেও উক্ত কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন আইন লঙ্ঘন করে তাঁর প্রিয় মহিষীর কক্ষসমূহে অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণের অজুহাতে অত্যন্ত হীন, জঘন্য ও অশোভনীয় ভাবে মূত্রত্যাগ করেছে এবং তদ্বারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে অতএব ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২ নং ধারা

উক্ত কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন ব্লেফুসকু দ্বীপ থেকে সমুদয় রণতরী আটক করে লিলিপুটের রাজকীয় বন্দরে নিয়ে এসেছিল। আমাদের সম্রাট তখন তাকে আদেশ দিলেন যে ব্লেফুসকু রাজ্যের বাকি সব জাহাজগুলো তুমি আটক করে নিয়ে এস। উক্ত দ্বীপকে সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে শাসন করবার প্রস্তাব করলেন। মহামান্য সম্রাট উক্ত পাহাড়-মানুষকে আদেশ করলেন উক্ত দ্বীপের সমস্ত নির্বাসিত বিগ-এনডিয়ান এবং উক্ত রাজ্যের সমস্ত মানুষকে হত্যা করতে যারা বিগ-এনডিয়ানদের সংশ্রব ছাড়তে রাজি হবে না। কিন্তু তখন ঐ পাহাড়-মানুষ ফ্লেস্ট্রিন মহামান্য সম্রাটের এই পবিত্র আদেশগুলো বিশ্বাসঘাতকদের মতো প্রত্যাখ্যান করে বলল যে একদল নির্দোষ ও দুর্বল মানুষদের হত্যা করতে তার বিবেকে বাধছে।

৩ নং ধারা

যেহেতু আমাদের মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে ব্লেফুসকু থেকে একদল রাষ্ট্রদূত এসেছিল তখন উক্ত ফ্লেস্ট্রিন সেই বিদেশে রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে যারা আমাদের শত্রু বলে পরিগণিত এবং যারা তাদের রাজার ভৃত্য ব্যতীত আর কিছু নয়, আমাদের দেশের প্রতি বিশ্বাসহানী করে মেলামেশা করেছিল এবং তাদের সান্ত্বানা দিয়েছিল বলেও প্রকাশ।

৪ নং ধারা

উক্ত কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন যার কর্তব্য একজন অনুগত প্রজার মতো এদেশে বাস করা সে তা না করে ব্লেফুসকু রাজ্যের সম্রাটের কাছে যাবার ব্যবস্থা করছে। যদিও আমাদের মহমান্য সম্রাট তাকে মৌখিক সম্মতি জানিয়েছে কিন্তু কোনো লিখিত অনুমতি দেন নি। তথাপি সে আমাদের সম্রাটের মাত্র মৌখিক সম্মতির বলে আমাদের শত্রুর দেশে যেতে চাইছে এবং তদ্বারা সে উক্ত শত্রু-সম্রাটকে পরোক্ষভাবে সান্ত্বানা দেবে এবং তার পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে সহায়ক হবে।

এছাড়া আরো কয়েকটি ধারা কিন্তু সেগুলো এখানে অবান্তর। আমি শুধু গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোই তুলে ধরলাম।

বিদায় নেবার আগে উক্ত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগপত্রটি নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে তার মন্ত্রী বা পরামর্শদাতাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে সম্রাট আপনার পক্ষ নিয়ে অনেক তর্ক করেছিলেন, আপনি দেশের অনেক উপকার করেছেন, দেশের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করেছেন এবং আপনার জন্যে সামান্যতম ক্ষতি সহ্য না করেও শত্রুকে অনায়াসে পরাজিত করতে পারা গেছে। কিন্তু কোষাধ্যক্ষ ও উক্ত এ্যাডমিরাল এতদূর শয়তান যে ওরা সম্রাটকে বলল যে আপনি যখন রাত্রে নিদ্রা যাবেন তখন আপনার বাড়তে আগুন লাগিয়ে আপনাকে পুড়িয়ে মারা হবে এবং সেনাপতি কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত থাকবে তারা আপনার মুখে ও হাতে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করবে। ওরা আরো স্থির করেছে যে আপনার কয়েকজন ভৃত্য মারফত আপনার শার্টে ও বিছানার চাদরে গোপনে একরকম তরল তীব্র বিষ মিশিয়ে

রাখবে, আপনি সেই শার্ট পরে বিছানায় শুলে শরীর এমন জ্বালা করবে যেন মনে হবে আপনি আপনার দেহের চামড়া ছিঁড়ে ফেলে দেন। ভীষণ কষ্ট পেয়ে আপনি মারা যাবেন।

মুখ্য সচিব রেলড্রেসার যে আপনার একজন বন্ধু বলে নিজেকে প্রচার করে তাঁকে সম্রাট আপনার সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে বলেছিলেন। রেলড্রেসার অবশ্য সম্রাটের ভয়ে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। তিনি বলেছিলেন পাহাড়-মানুষের অপরাধ হয়তো গুরুতর কিছু তবুও তার প্রতি দয়া প্রকাশ করার অবকাশ আছে এবং দয়া ও ক্ষমাই তো হল রাজার ধর্ম। আর এই দয়া ও ক্ষমার জন্যেই তো আমাদের সম্রাট বিশ্বনন্দিত। পাহাড়-মানুষ যে আপনার বন্ধু এ কথা সারা দেশ জানে, আপনি তাকে উচ্চ উপাধিও দিয়েছেন তাই হয়তো সে প্রশ্রয় পেয়ে এমন কিছু করেছে যা আপনার মনে আঘাত দিয়েছে তবুও আপনি তাকে যদি শাস্তি দেন তাহলে প্রাণে মারবেন কেন? আপনি বরঞ্চ তাকে শাস্তি স্বরূপ অন্ধ করে দিন তাহলে তার প্রতি সুবিচারও করা হবে অথচ আইন ভঙ্গের অপরাধে তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে এবং আপনার উদারতায় সকলে প্রশংসাই করবে। অন্ধ হয়ে গেলেও তার দৈহিক শক্তি অক্ষুণ্ন থাকবে এবং সম্রাটের আদেশে কাজও করতে পারবে। মুখ্য সচিব সম্রাটকে আরো বুঝিয়েছে যে শত্রুর জাহাজগুলো টেনে আনবার সময় পাহাড়-মানুষের ভয় ছিল শত্রুর তীর বিঁধে সে বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে। এখন অন্ধ হলে সে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাকে আমাদের চোখ দিয়েই দেখতে হবে, তাকে আমরা যে দেখাব সেই তাই দেখবে।

কিন্তু মন্ত্রণা-সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। এ্যাডমিরাল বলগোলাম তো রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, মুখ্য সচিব এ কী বলছেন? একটা বিশ্বাসঘাতককে বাঁচিয়ে লাখতে হবে? উক্ত ভদ্রলোক আমাকে বলতে লাগলেন, আপনি যেসব উপকার করেছেন তা এখন আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আপনি মূত্রত্যাগ করে ওদের ডুবিয়ে মারতে পারেন। কিংবা রাজপ্রাসাদটাই নষ্ট করে দিলেন? আপনি শত্রুপক্ষের জাহাজগুলো ধরে এনেছেন কিন্তু সেগুলো তো আবার ফিরিয়েও দিয়ে আসতে পারেন। কে আপনাকে বাধা দেবে? বলগোলামরা বলতে চায় যে মনে মনে আপনি একজন বিগ-এনডিয়ান, শত্রুপক্ষের সমর্থক অতএব আপনি রাজদ্রোহী এবং আপনার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

কোষাধ্যক্ষর ঐ একই মত। সে বলে, শয়তানটাকে বাঁচিয়ে রেখে কী হবে? ওকে পুষতেই তো আমাদের রাজকোষ শূন্য হয়ে আসছে এবং আর কিছু দিন পরে ওকে খাওয়াবার জন্যে আর এক কপর্দকও সিন্দুকে পড়ে থাকবে না। তাকে অন্ধ করে দিলেও তো খাওয়াতে হবে। অন্ধ লোককে দিয়ে বেশি কাজও করানো যাবে না। বসে বসে খাবে আর ঘুমোবে আর আরো মোটা হবে আরো খেতে চাইবে, খেতে না পেলে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তখন কানা মানুষ ক্ষেপে গিয়ে, কী ক্ষতি করবে কে জানে? অতএব আপনি যে একজন ঘোরতর অপরাধী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে অপরাধ করেছেন তার আর ক্ষমা নেই আর বিষয়টি তলিয়ে দেখবার বা পুনর্বিচার করবার আর অবকাশও নেই, অতএব আপনার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

উক্ত ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, আমাদের মহামান্য সম্রাট কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, মানুষটাকে যে কোনো সময়ে অন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আর

কেউ অন্য কোনো শাস্তির কথা বলতে পারেন নি? তখন আপনার বন্ধু ঐ মুখ্যসচিব নতুন প্রস্তাব করলেন, কোষাধ্যক্ষ মহাশয় বলছেন যে পাহাড়-মানুষকে খাওয়াতে রাজকোষের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে এবং পাহাড়-মানুষকে খাওয়াতে গিয়ে আমরাই হয়তো অনাহারে মারা যাব। তাহলে আমার একটা অন্য প্রস্তাব আছে, পাহাড়-মানুষের আহারের বরাদ্দ ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হোক তাহলে সেও ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাবে। তাছাড়া কম খেতে খেতে তার খাবার ইচ্ছোও কমে যাবে, সে দুর্বল হতে থাকবে, মাঝে মাঝে হয়তো অজ্ঞানও হয়ে যাবে এবং কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে। যখন মারা যাবে তখন স তো হাড্ডিসার মৃতদেহ পচে গলেও তেমন দুর্গন্ধ নির্গত হবে না। আরো একটা কথা। তখন তো সে অনেক রোগা হয়ে গেছে, পাঁচ ছ হাজার লোক লাগিয়ে দিলে তারা ওর লাশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও মাটিতে টুকরোগুলো পুঁতে দেবে। তাহলে দেহ এক জায়গায় পড়ে থেকে পচে গিয়ে রোগ ছড়াতে পারবে না আর তার কংকালটা তার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা দেখে অবাক হবে।

মুখ্য সচিবের উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হল। আপনাকে অনাহারে রাখার প্রস্তাবটা গোপন রাখা হয়েছে কিন্তু আপনাকে অন্ধ করার প্রস্তাব খাতায় লেখা হয়ে গেছে। এই প্রস্তাবে একমাত্র এ্যাডমিরাল হল সম্রাজ্ঞীর লোক, তাঁর আজ্ঞাবাহী। সম্রাজ্ঞী আপনার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। আপনি যে ভাবে প্রাসাদে তাঁর কক্ষগুলোর আগুন নিবিয়েছেন শুধু বেআইনী নয় তাঁদের মতে ঘৃণ্য। এই কারণে সম্রাজ্ঞী সেই রাত্রি থেকেই আপনার প্রতি বিরূপ।

আপনার প্রিয় বন্ধু সেক্রেটারি মশাই আর তিন দিনের মধ্যে আপনার কাছে আসবেন এবং আপনার প্রতি অভিযোগের ধারাগুলি পড়ে শোনাবেন। তিনি আরও জানাবেন যে আমাদের মহামান্য সম্রাট আপনার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন নি শুধু আপনার চক্ষু দুটি বাজেয়াপ্ত করা হবে। আশা করা হচ্ছে যে আপনার প্রতি সম্রাটের এই অনুগ্রহ কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে নেবেন এবং আপনার চক্ষুদ্বয় বাজেয়াপ্ত করতে সম্রাটের কুড়িজন সার্জন যখন আসবেন তখন আপনি শুয়ে পড়বেন। সার্জনরা তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে আপনার চক্ষুর মণিতে আঘাত করে সম্রাটের আদেশ পালন করবেন।

উক্ত ভদ্রলোক বললেন আপনি কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন সে আপনই স্থির করবেন, তবে আমি অপরের সন্দেহ এড়িয়ে যেভাবে এসেছি সেইরূপ গোপনে অবিলম্বে ফিরে যেতে চাই।

উনি চলে গেলেন এবং আমি আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে লাগলাম। মন বিক্ষিপ্ত, নানা সন্দেহ।

আমি লক্ষ করেছি যখনি কোনো রাজা স্বয়ং বা তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শে কোনো ব্যক্তিকে দণ্ডবিধান করেন তখনি তাঁরা একটা লম্বা বক্তৃতা দেন যে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে লঘু দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা সে মৃত্যুদণ্ড, বেতমারা বা আজীবন নির্বাসন যাইহোক না কেন। সম্রাট যে অত্যন্ত দয়াবান, এই কথাটা সাড়ম্বরে প্রচার করা হয় এবং শাস্তি যত বেশি নিষ্ঠুর হয় বক্তৃতাও তত বেশি লম্বা হয়। সব ক্ষেত্রে দোষ যে

সম্পুর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয় তাও নয়। আমি কোনোদিনই কোনো রাজদরবারে প্রবেশ করতে পারি নি, সে যোগ্যতাও আমার ছিল না অতএব রাজাদের কখন কী মর্জি হয় এবং তাঁদের দৃষ্টিতে কোনটা কড়া আর কোনটা কোমল সে বিচার করবার বুদ্ধিও আমার ছিল না তবে আমার ক্ষেত্রে আমার জন্যে সম্রাট যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তার কোথায় সম্রাটের দয়া প্রকাশ করা হয়েছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। যাহোক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের ধারাগুলো পড়ে আমার মনে হয়ছিল যে এদের বিচারে আমি হয়তো অপরাধ করেছি যদিও আমার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এবং সেজন্যে আমি প্রশ্ন করতে পারি যে আমার অপরাধ কি ক্ষমার অযোগ্য? যাহোক আমার অবর্তমানে আমার বিচার করে আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, শত্রু পক্ষও প্রবল এবং শাস্তি হয়তো আমার মেনে নেওয়া কর্তব্য। তথাপি আমি মনে মনে জানি যে আমি যতক্ষণ মুক্ত আছি ততক্ষণ এরা আমার কিছুই করতে পারবে না, আমি এখনি প্রতিবাদ করতে পারি, বাধা দিতে পারি, ক্ষতি করতে পারি এবং তা করলে ওদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। আমি গোটাকতক পাথর ছুঁড়ে শহরটাকে ধ্বংস করে দিতে পারি কিন্তু এই সর্বনাশা কাণ্ড করতে আমার মোটেই ইচ্ছে হল না কারণ আমার মুক্তির জন্যে আমি সম্রাটের কাছে শপথ নিয়েছি এবং তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্যও পেয়েছি এবং তিনি দেশের সর্বোচ্চ যে 'নারডাক' উপাধি দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন তারও তো একটা মর্যাদা আছে। তা সত্ত্বেও আমাকে যে সম্রাট ও তাঁর পরমার্শদাতাগণ আরোপিত শাস্তি মেনে নিতে হবে তার কোনো যুক্তি নেই।

অবশেষে আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে অতি উৎসাহে এবং আমার অভিজ্ঞতার অভাবে আমি যে সব কাণ্ড করেছি এবং আমাকে সেজন্যে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা আমি মানব না। আমার স্বাধীনতা এবং আমার দুই চোখ আমি হারাতে চাই না। অন্য দেশে দেখেছি যে আসামীর প্রতি দণ্ডবিধানের আগেই তার উপর নির্যাতন চালানো হয় এবং আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু করাও হয় নি। এখন আমি মুক্ত ও স্বাধীন। আমি তো একটা কাজ করতে পারি এবং সেজন্যে সম্রাট আমাকে মৌখিক সম্মতিও দিয়েছেন। আমি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ব্লেফুসকু দ্বীপে চলে যেতে পারি। তাই করা উচতি। এবং তা করতে হবে তিন দিনের মধ্যেই কারণ এই তিন দিনের মধ্যে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমার প্রতি যে দণ্ডবিধান করা হয়েছে তা তো আমি জানি না এবং সরকারিভাবে আমাকে জানানও হয় নি অতএব আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়ে পালিয়েও যাচ্ছি না। এই মত স্থির করে আমি আমার সেই বন্ধু মুখ্য সচিবের নামে একখানি চিঠি লিখে রাখলাম যে আমি আজ সকালে ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাটের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে সেই দ্বীপে যাচ্ছি। তাঁর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি দ্বীপের সেই অংশে গেলাম যেখানে নৌবহর রাখা আছে। আমি সবচেয়ে বড় মনোয়ার যুদ্ধ জাহাজটা বেছে নিলাম, তাতে একটা দড়ি বাঁধলাম এবং যাতে ভিজে না যায় এজন্যে আমি সব পোশাক খুলে জাহাজটার ওপর (শুধু আমার বিছানার চাদরটা বগলদাবা করে রাখলাম) জড়ো করে রেখে নোঙর তুলে জাহাজটাকে টানতে টানতে ব্লেফুসকু দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। গোড়ায় জল কম ছিল, হেঁটে চললাম তারপর জল যখন বেশি তখন সাঁতার কাটি এই ভাবে ব্লেফুসকু দ্বীপের রাজবন্দরে পৌঁছলাম। ঐ দ্বীপের লোকেরা আমার আগমন

অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে ওরা ভয় পেল না। রাজবাড়ি যাব শুনে দুজন পথ প্রদর্শক দিল। রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করলাম। দ্বীপের যা নাম রাজধানীরও তাই নাম। পথ-প্রদর্শক দুজনকে আমার হাতে তুলে নিয়েছিলাম। রাজবাড়ির ফটকের দু'শ গজের মধ্যে এসে আমি আমার পথ প্রদর্শক দুজনকে নামিয়ে দিয়ে তাদের বললাম, কোনো একজন সচিবকে খবর দিয়ে বল আমি বাইরে সম্রাটের আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছি। এক ঘণ্টা পরে সাড়া পেলাম। রাজপরিবারসহ সম্রাট স্বয়ং এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। সঙ্গে এসেছেন দরবারের সভাসদগণ। আমি একশ গজ এগিয়ে গেলাম। সম্রাট ও তাঁর সঙ্গীগণ ঘোড়া থেকে নামলেন, সম্রাজ্ঞী ও মহিলারা নামলেন তাঁদের গাড়ি থেকে। আমার বৃহৎ শরীর দেখে তাঁরা যে ভয় পেয়েছেন আমার মনে হল না। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর হস্ত চুম্বন করবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। সম্রাটকে আমি বললাম যে আমি তাঁর কাছে আসব কথা দিয়েছিলাম। এখন আমি পরাক্রমশালী সম্রাটের দর্শন পেলাম এবং তাঁর কোনোরকম সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। এদেশে আসবার জন্যে আমার সম্রাট আগেই তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন কিন্তু আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে সেসব কথা আমি উচ্চারণ করলাম না। কারণ আমাকে তো কিছু জানানো হয় নি অতএব এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকাই ভালো। আমি যে সব জেনেশুনেই এই দ্বীপে পালিয়ে এসেছি এমন কোনো ধারণা আমার সম্রাট করতে পারবেন না। কিন্তু আমি বোধহয় ভুল বুঝেছিলাম।

ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাট ও জনগণ আমাকে কীভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণী জানিয়ে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না তবে মহান সম্রাট তাঁর উদারতা অনুযায়ীই আমাকে সমাদর করেছিলেন। এখানে আমি বাড়ি পাই নি, অসুবিধা হচ্ছিল। শোবার ব্যবস্থাও নেই, বিছানার চাদর জড়িয়ে মাটিতেই শুতে হল, এসব অসুবিধার কথাও এখন মুলতুবি থাক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[সৌভাগ্যক্রমে লেখক অকস্মাৎ এমন একটা কিছু পেলেন যার সাহায্যে তিনি কিছু বিপদ কাটিয়ে ব্লেফুসকু ত্যাগ করে স্বদেশে নিরাপদে ফিরতে পেরেছিলেন।]

ব্লেফুসকু দ্বীপে আমি তিন দিন এসেছি। একদিন ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের উত্তর-পুব দিকে গেছি। দূরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখছি। আধ লিগ আন্দাজ দূরে কী যেন একটা চোখে পড়ল, একটা নৌকো যেন উলটে গেছে। অমনি তখনি আমার জুতো মোজা খুলে ফেললাম তারপর জল ভেঙে সেই উলটানো নৌকোর দিকে এগিয়ে চললাম, এখানে সমুদ্র অগভীর। প্রায় দুই তিনশ গজ যাবার পর মনে হল জোয়ারের টানে বস্তুটা বুঝি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আরো কাছে আসতে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওটা সত্যিই একটা নৌকো। ওটা বোধহয় ঝড়ে কোনো জাহাজ থেকে ছিটকে সমুদ্রে পড়ে গেছে। তারপর ভাসতে ভাসতে এদিকে চলে এসেছে। আমি তখনি শহরে ফিরে এলাম এবং রাজাবাহাদুরকে বললাম তাঁর নৌবহর বাজেয়াপ্ত হবার পরও যে সব জাহাজ আছে

তাদের মধ্যে উচ্চতম কুড়িটি জাহাজ এবং ভাইস এ্যাডমিরালের অধীন তিন হাজার নাবিক যদি আমাকে দেন তো আমার উপকার হয়। রাজাবাহাদুরের আদেশ পেয়ে পাল তুলে জাহাজগুলো ছেড়ে দিল। আমি হাঁটাপথে দ্বীপের উত্তর-পুব দিকে সেখানে গেলাম যেখানে নৌকোটি দেখা গিয়েছিল। জোয়ার তখন অনেক এগিয়ে এসেছে। নাবিকদের কাছে আছে দড়ি। আমি আগেই ওদের সুতোর মতো দড়ি পাকিয়ে মোটা করে নিয়েছিলাম। দড়িগুলো বেশ মজবুত হয়েছিল। এদিকে জাহাজগুলো কাছে এসে পড়েছে, আমি জামা-কাপড় খুলে জলে নেমে পড়ে নৌকোটার দিকে এগিয়ে চললাম কিন্তু নৌকো যখন আর একশ গজ দূরে তখন আমাকে সাঁতার কাটতে হল কারণ ইতোমধ্যে জল বেড়েছে। যখন নৌকো আমার হাতের নাগালে তখন নাবিকরা আমার দিকে দড়ি ছুড়ে দিল। নৌকোতে একটা গর্তে আমি সেই দড়ি বাঁধলাম। আর অপর প্রান্ত একটা মনোয়ারি জাহাজের সঙ্গে বাঁধলাম কিন্তু আমার পরিশ্রম কোনো কাজে লাগল না। আমার পা জমিতে থাকলে যে জোর পেতাম এখন তো সে জোর পাচ্ছি না অতএব আমি নাবিকদের পুরো সাহায্য করতে পারছি না। তবুও আমি ঘুরে নৌকোর অপর দিকে চলে গেলাম এবং এক হাত দিয়ে নৌকোটাকে ডাঙার দিকে ঠেলতে লাগলাম। জোয়ারের কিছু সাহায্য পাচ্ছিলাম। খানিকটা এগিয়ে আসা গেল, জল আমার দাড়ি পর্যন্ত কিন্তু পায়ের নিচে মাটি পাওয়া গেল। দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম, দম ফুরিয়ে গিয়েছিল তারপর নৌকোটাকে আবার ঠেলা মারতে লাগলাম। ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছি, জল এখন আমার বুক পর্যন্ত। এবার খুব খাটুনির কাজ আরম্ভ হল। জাহাজে যে দড়িগুলো রাখা ছিল সেগুলো বার করে নৌকার সঙ্গে বাঁধলাম আর অপর প্রান্ত বাঁধলাম ন'টা জাহাজের সঙ্গে। বাতাস এখন জাহাজগুলোর পালের অনুকূলে আর আমিও নৌকাটাকে ঠেলা মারছি। এই রকম করে ডাঙার চল্লিশ গজের মধ্যে এসে গেলাম। ভাঁটা আরম্ভ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তারপর নৌকোতে আরো দড়ি বেঁধে, দুহাজার নাবিকও ইঞ্জিনের সাহায্যে নৌকাটাকে সোজা করা গেল। পরীক্ষা করে দেখলাম নৌকোটার বিশেষ ক্ষতি হয় নি।

এবার দরকার দাঁড়ের। দাঁড় তৈরি করবার জন্যে দশদিন ধরে আমাকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার বিবরণ জানিয়ে আমি পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। দাঁড় তৈরি করে নৌকোটাকে আমি ব্লেফুসকুর রাজবন্দরে নিয়ে গেলাম। এই অদ্ভুত জলযানটি দেখবার জন্যে সেখানে তখন হাজার হাজার নরনারী জমায়েত হয়েছে। আমি রাজাবাহাদুরকে বললাম যে সৌভাগ্যক্রমে নৌকোটি আমার দৃষ্টিপথে এসে গেছে। আমি এখন এই নৌকো ভাসিয়ে এমন কোনো জায়গায় যেতে পারব যেখান থেকে আমি আমার স্বদেশে ফিরে যেতে সক্ষম হব। আমি রাজাবাহাদুরের কাছে সাহায্য-ভিক্ষা করলাম যাতে আমি নৌকোটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারি। কারণ সমুদ্র যাত্রায় অনেক কিছু প্রয়োজন হবে। এছাড়া দেশ ছাড়বার জন্যে রাজাবাহাদুরের অনুমতিও চাইলাম। তিনি অনেক বাহানা করার পর সম্মতি দিলেন।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এতদিন তো আমি এই দ্বীপে এসেছি কিন্তু লিলিপুট দ্বীপের সম্রাট ব্লেফুসকু দ্বীপের রাজাবাহাদুরের কাছে আমার জন্যে তো একবারও খোঁজ করলেন না? আমার ধারণা ঠিক নয়। পরে অন্য সূত্র থেকে আমি

জানতে পারলাম যে লিলিপুট দ্বীপের সম্রাটের ধারণা যে আমার প্রতি তাঁরা যে শাস্তি প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন তা আমি না জেনে এবং সম্রাটের মৌখিক সম্মতির বলে শুধু আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে ব্লেফুসকু দ্বীপে গেছি অতএব কয়েকদিন পর সেখানে ফিরে গেলেই আমার প্রতি পূর্ব নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তিন উদ্বিগ্ন হলেন। তখন তাঁর কোষাধ্যক্ষ ও পরামর্শদাতাদের মত নিয়ে, আমাকে অভিযুক্ত করে যে অভিযোগ পত্র রচিত হয়েছিল সেইটি সমেত একজন দূত ব্লেফুসকু দরবারে প্রেরিত হল। সেই দূতকে ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুরকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে আমার কোনো অপরাধের জন্যে লিলিপুট সম্রাট আমাকে খুব লঘু শাস্তিই দিয়েছেন, শুধু আমার চোখদুটি উপড়ে ফেলা হবে। আমি বিচার এড়াবার জন্যে পালিয়ে গেছি এবং যদি দুঘণ্টার মধ্যে ফিরে না যাই তাহলে আমাকে দেওয়া 'নারডাক' উপাধি কেড়ে নেওয়া হবে এবং আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করা হবে। সেই দূত আরো বলল যে দুই দ্বীপের মধ্যে শান্তি ও প্রীতি রক্ষার জন্যে তাঁর প্রভু মহামান্য সম্রাট আশা করেন যে, তাঁর ভ্রাতা ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর আমার হাত পা বেঁধে আমাকে ফেরত পাঠাবেন যাতে বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়।

লিলিপুটের সম্রাটকে উত্তর দেবার জন্যে ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর তাঁর আমাত্যদের সঙ্গে তিন দিন ধরে পরামর্শ করলেন এবং কিছু অজুহাতে দেখিয়ে অনেক বিনয় প্রকাশ করে উত্তর দিলেন। তিনি লিখলেন ভ্রাতা জানেন যে লোকটির হাত পা বাঁধা অসম্ভব এবং পাঠানও এক সমস্যা। যদিও এই লোকটি তাঁর নৌবহর আটক করে নিয়ে গিয়েছিল তথাপি দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে সে বড় একটা অংশগ্রহণ করেছিল সেজন্যে তার কাছে আমি ঋণী। তবে আমরা উভয়েই তার হাত থেকে শীঘ্রই অব্যাহতি পাব কারণ আমার দ্বীপের অনতিদূরে সে এমন একটি জলযান পেয়েছে যার সাহায্যে সে শীঘ্রই এই দ্বীপ ত্যাগ করবে। আমি অবশ্য জলযানটি সাগর পাড়ি দেবার উপযোগী করতে সাহায্য করেছি। এমন একটি মানুষকে ভরণপোষণ করা আমাদের উভয়ের পক্ষে অসম্ভব। যাহোক আমরা অচিরেই হাত থেকে মুক্তি পাব।

এই উত্তর নিয়ে রাষ্ট্রদূত লিলিপুটে ফিরে গেল। ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর আমাকে সব জানালেন এবং আমাকে অতি গোপনে বললেন যে যতদিন আমি তাঁর কাছে থাকব ততদিন তিনি আমায় আশ্রয় দেবেন ও রক্ষা করবেন। আমি যদিও তাঁর আন্তরিকতায় বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু রাজা ও মন্ত্রীদের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই। আমি এখন ওঁদের এড়িয়ে চলতে চাই। অতএব আমি তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, আমাকে ক্ষমা করবেন স্বদেশে ফেরবার জন্যে আমি এখন ব্যাকুল। সৌভাগ্য বশত আমি যখন একটা জলযান পেয়েই গেছি তখন ভালোই হোক আর মন্দই হোক আমি ঐ জলযান আশ্রয় করে সমুদ্রে ভেসে পড়তে চাই। আপনাদের মতো দুটি শক্তিশালী দেশের মধ্যে আমি আর বিবাদের কারণ হয়ে থাকতে চাই না। আমার কথা শুনে রাজাবাহাদুর অসন্তুষ্ট হলেন না বরঞ্চ আমার প্রস্তাব শুনে তিনি ও তাঁর মন্ত্রীরা আনন্দিতই হলেন।

রাজাবাহাদুর ও তাঁর মন্ত্রীদের সমর্থন লাভ করে আমি আমার যাত্রার দিন আরো এগিয়ে আনলাম। আমি লক্ষ করলাম যে যাতে আমি তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে পারি

সেজন্যে সভাসদরাও উদ্যোগী হয়েছে। নৌকোর একটা পাল তৈরি করবার জন্যে পাঁচশত কর্মী নিযুক্ত হল। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে লাগল। দ্বীপে প্রাপ্ত সবচেয়ে মজবুত কাপড় সংগ্রহ করে এবং সেগুলো বার তের ভাজ করে কাজচলা গোচের দুটো পাল তৈরি করা গেল। পাল খাটাবার জন্যে মোটা দড়ি দরকার। দশটা, কুড়িটা এমন কি তিরিশটা পর্যন্ত দড়ি পাকিয়ে মোটা ও যতদূর সম্ভব লম্বা দড়ি তৈরি করলাম। দ্বীপে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বড় একটা পাথর সংগ্রহ করলাম যেটা আমার নোঙরের কাজ করবে। নৌকোতে লাগাবার জন্যে এবং অন্য কাজের জন্যে আমাকে তিনশটি গরুর চর্বি যোগাড় করে দেওয়া হল। মাস্তুল ও দাঁড় তৈরি করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। বড় বড় গাছ কেটে তাও তৈরি করা হল। রাজাবাহাদুরের ছুতোর মিস্ত্রিরা সেগুলো মসৃণ করে দিয়েছিল।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে প্রায় এক মাস সময় লাগল এবং বিদায় নেবার জন্যে আমি রাজাবাহাদুরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। রাজাবাহাদুর এবং রাজপরিবারের সকলে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজাবাহাদুরের হস্ত চুম্বন করবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। অনুগ্রহ করে তিনি ও পরে মহারানি ও রাজকুমাররাও তাদের হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাজাবাহাদুর আমাকে পঞ্চাশটি থলি উপহার দিলেন। প্রতি থলিতে ছিল দুইশতটি স্প্রাগ মুদ্রা। তিনি তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব ছবিও দিলেন। এগুলো আমি সযত্নে আমার একটি দস্তানার মধ্যে ভরে রাখলাম। বিদায় অনুষ্ঠানের দীর্ঘ বিবরণী পাঠকদের পীড়িত করতে পারে এজন্যে আমি বিরত হলাম।

নৌকোতে আমি একশটি বলদ ও তিনশ ভেড়ার মৃতদেহ বোঝাই করলাম এবং অনুরূপ পরিমাণে রুটি ও সুরা এবং চারশ বাবুর্চি যত মাংস রান্না করে দিতে পারল তত পরিমাণ মাংস। আমি সঙ্গে নিলাম ছটি জীবন্ত গরু ও দুটি ষাঁড় এবং অতগুলো মাদী ও পুরুষ ভেড়া। দেশে যদি ফিরতে পারি তো ওদের বাচ্চা উৎপাদন করাব। ওদের খাওয়াবার জন্যে অনেক বোঝা খড় ও দানা নিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল বারজন স্থানীয় নরনারী সঙ্গে নিতে কিন্তু তাঁদের অনিচ্ছা দেখে আমি বিরত হলাম তথাপি রাজাবাহাদুরের লোকেরা আমার পকেটগুলো একবার দেখে নিল, কৌতুক করেও আমি কাউকে তুলে নিয়েছি কিনা দেখবার জন্যে।

এইভাবে প্রস্তুত হয়ে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখে সকাল ছটায় আমি পাল তুলে দিলাম। উত্তর দিকে চার লিগ যাবার পর উত্তর-পুব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসে আমার নৌকোর পাল ফুলে উঠল এবং সন্ধ্যা ছটা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম দিকে আধ লিগ আন্দাজ দূরে একটা ছোটো দ্বীপ দেখতে পেলাম। দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং বাতাসের বিপরীত দিকে গিয়ে নোঙর ফেললাম। দ্বীপে নেমে বুঝলাম ওখানে মনুষ্যবাস নেই। কিছু আহার করে বিশ্রাম করতে লাগলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বোধহয় ছঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম কারণ আমি জেগে ওঠার আর দুঘণ্টা পরে ভোর হল। রাত্রিটা বেশ পরিষ্কার ছিল। সূর্য উঠার আগেই আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম। লক্ষ করলাম বাতাস অনুকূল অতএব নোঙর তুলে নৌকো ছেড়ে দিলাম। আগের দিন যে দিকে যাচ্ছিলাম সেই দিকেই চললাম। সঙ্গে একটা পকেট কম্পাস ছিল, সেই ছোট্ট কম্পাস আমায় দিক ঠিক করতে সাহায্য করছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে সম্ভব হলে

এমন একটা দ্বীপে পৌছনো যেটা ভ্যান ডিমেনস দ্বীপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। আমার ধারণা এমন একটা দ্বীপ ওদিকে আছে। কিন্তু সারা দিনেও কোনো দ্বীপ আবিষ্কার করতে পারলাম না। পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ আমি হিসেব করে দেখলাম যে ব্লেফুসকু দ্বীপ থেকে চব্বিশ লিগ পর্যন্ত এসেছি আর ঠিক সেই সময়ে আমি দক্ষিণ-পুব দিকে জাহাজের পাল দেখতে পেলাম। আমি তখন যাচ্ছিলাম পুব দিকে। আমি সেই জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে যেতে লাগলাম। তখন বাতাসের বেগ কমে আসছে। তবুও আমি নানাভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। আধঘণ্টা বাদে আমার চেষ্টা সফল হল। ওরা আমাকে দেখতে পেল এবং তা জানিয়ে দেবার জন্যে একটা পতাকা তুলল আর সেই সঙ্গে করল কামানের আওয়াজ। তখন যে আমার কী আনন্দ হল তা কী বলব। আমি আবার স্বদেশে ফিরে যেত পারব, আবার আমার চেনামুখগুলো দেখতে পাব। জাহাজ তার গতি কমাল। তারিখটা আমার মনে আছে, ২৬ সেপ্টেম্বর। জাহাজের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পাঁচটা বেজে গেছে কিন্তু ছটা বাজে নি। পতাকা দেখে যখন চিনতে পারলাম যে জাহাজটা ব্রিটিশ তখন আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠল। গরু ও ভেড়াগুলো আমার পকেটে নিলাম এবং খাদ্যদ্রব্য সমেত সমস্ত মালপত্তর জাহাজে তুললাম। জাহাজখানা ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ, উত্তর এবং দক্ষিণ সমুদ্র দিয়ে জাপান থেকে আসছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ জন বিডেল ডেপ্টফোর্ডের মানুষ, অতি সজ্জন ব্যক্তি এবং জাহাজ চালনায় দক্ষ। আমরা এখন দক্ষিণে ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশে রয়েছি। জাহাজে প্রায় পঞ্চাশ জন এবং আমার একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল, তার নাম পিটার উইলিয়মস। পিটার আমাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় আমার কিছু গুণগান করল। ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে আসছি এবং কোথায় যেতে চাই। আমি যখন সংক্ষেপে সবকিছু বললাম তখন তাঁরা ভাবলেন আমি বাজে কথা বলছি কিংবা সমুদ্রে বিপদে পড়ার ফলে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি পকেট থেকে যখন জীবন্ত গরু ভেড়াগুলো একে একে বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম তখন তো তারা অবাক। তারা বুঝল আমি ওদের ধোঁকা দিই নি। ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর আমাকে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো এবং রাজাবাহাদুরের পূর্ণাবয়ব ছবিটি এবং ঐ দুই দ্বীপের কিছু অদ্ভুত জিনিস ক্যাপ্টেনকে দেখালাম। একশত স্প্রাগ ভর্তি দুটি থলি আমি ক্যাপ্টেনকে উপহার দিলাম এবং বললাম যে ইংল্যান্ডে পৌঁছলে আমি তাঁকে বাচ্চা সমেত একটি গরু ও একটি ভেড়া উপহার দেব।

আমি এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণী দিয়ে পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না তবে বাকি যাত্রাপথ বেশ নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল আমরা ইংল্যান্ডের ডাউনস-এ পৌঁছলাম। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ইঁদুর আমার একটি ভেড়া ধরে নিয়ে গিয়েছিল, হাড়গুলো একটা গর্তে পেয়েছিলাম, মাংস পরিষ্কার করে খেয়ে নিয়েছিল। বাকি পশুগুলো সবুজ ঘাস ভর্তি একটা মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল ওরা হয়তো এদেশে টিকবে না কিন্তু আমার সব আশঙ্কা দূর করে ওরা দিব্যি ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জাহাজেও তাদের হয়তো বাঁচিয়ে আনতে পারতাম না

যদি নাকি ক্যাপ্টেন আমাকে তাঁর ভাঁড়ার থেকে কিছু বিস্কুট না দিতেন। এই বিস্কুট গুঁড়ো করে জলে গুলে আমি তাদের খাওয়াতাম। তাঁরপর আমি ইংল্যান্ডে যে কটা দিন ছিলাম আমি আমার ক্ষুদ্র পশুগুলো ইংল্যান্ডে নামীদামি ব্যক্তিদের দেখিয়ে বেশ দুপয়সা আয় করেছিলাম। আমি আমার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করবার পূর্বে পশুগুলো ছ'শো পাউন্ডে বেঁচে দিয়েছিলাম। পরের সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে এসে খবর নিতে গিয়ে দেখলাম ভেড়াগুলো ছানা পোনা বিইয়ে সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। ওদের কোমল পশমের নিশ্চয় খুব চাহিদা হবে। আমি আমার স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে দুমাস থাকলাম কিন্তু আরো দূর দেশ দেখবার জন্যে আমার ভ্রমণ-পিয়াসী মন চঞ্চল হয়ে উঠল। নিশ্চিন্ত পারিবারিক জীবন আমাকে আটকে রাখতে পারল না। আমি আমার স্ত্রীর হাতে দেড় হাজার পাউন্ড দিলাম এবং তাকে রেডরিফ-এ একটি বাড়িতে থিতু করেছিলাম। যে টাকা বাকি রইল তা থেকে নগদ কিছু সঙ্গে রাখলাম, কিছু জিনিস কিনলাম। সেগুলো বিদেশে বেচে মোটা লাভ করতে পারব। এপিং-এর কাছে আমার বড় আংকল আমাকে খানিকটা জমি দিয়েছিলেন যা থেকে বার্ষিক প্রায় তিরিশ পাউন্ড পাওয়া যেত। এছাড়া ফেটার লেনে আমি 'ব্ল্যাকবুল' পানশালা দীর্ঘ মেয়াদী লিজে রেখেছিলাম। তা থেকেও ভালো আয় হত। অতএব আমি আমার পরিবারের ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি। পরে ওদের অপরের দয়ায় নির্ভর করতে হবে না। আমার ছেলের নাম জনি, নামকরণ তার আংকলের নামানুসারে, এখন গ্রামের স্কুলে পড়ছে, শান্ত বালক। আমার মেয়ে বেটি (তার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেপুলেও হয়েছে) সেলাই নিয়ে মেতে আছে। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কাছে বিদায় নিলাম। সকলের চোখেই জল। তারপর জাহাজে গিয়ে উঠলাম। জাহাজটির নাম 'অ্যাডভেঞ্চার', তিনশ টনের মালবাহী জাহাজ, ভারতবর্ষে সুরাট অভিমুখে যাবে। ক্যাপ্টেনের নাম জন নিকোলাস, লিভারপুলবাসী। আমার এই সমুদ্রযাত্রার বৃত্তান্ত আমার ভ্রমণকাহিনীর দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হবে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভাগ
ব্রবডিংনাগদের দেশে

প্রথম পরিচ্ছেদ

[তুমুল ঝড়ের বিবরণ। জাহাজ থেকে লম্বা নৌকো নামিয়ে দ্বীপে পাঠানোর হল পানীয় জল আনতে। দ্বীপটা দেখবার জন্যে লেখকও সঙ্গী হলেন। তাঁকে ফেলে সঙ্গীরা চলে গেল, স্থানীয় এক অধিবাসী লেখককে পাকড়াও করে এক চাষীর বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে আশ্রয়লাভ এবং কয়েকটি দুর্ঘটনা। সেই দেশ-বাসীদের বর্ণনা।]

আমার চঞ্চল প্রকৃতি আর অস্থির জীবন আমাকে শান্তিতে ঘরে চুপ করে বসে থাকতে দেবে না। তা নইলে অত সব কাণ্ড কারখানার পর দুমাসের মধ্যেই আমার পায়ে কে এমন সুড়সুড়ি দিতে লাগল? অতএব আমি আবার স্বদেশ ত্যাগ করলাম এবং ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুন ডাউনস-এর গিয়ে জাহাজে উঠলাম। জাহাজের নাম এ্যাডভেঞ্চার, ক্যাপটেনের নাম জন নিকোলাস, কর্নওয়ালের মানুষ, দক্ষ কমান্ডার। জাহাজ যাবে সুরাট। জাহাজ থেকে মালপত্তর নামাতে হল। মেরামত করতে সময় লাগবে। শীত পড়েছিল, স্থির হল শীতটা এখানেই কাটিয়ে যাব। অন্য একটা কারণও ছিল। ক্যাপটেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সারা দেহে অজানা ব্যথা। 'কেপ অফ গুড হোপ' বন্দর ছাড়তে ছাড়তে মার্চ মাস হয়ে গেল। পাল তোলা হল, পালে বাতাস লাগল, পাল ফুটে উঠল, জাহাজ চলল। ম্যাডাগাসকার প্রণালী একদিনে পার হলাম নির্ঝঞ্ঝাটে। কিন্তু প্রণালী পার হয়ে ম্যাডাগাসকার দ্বীপের উত্তরে পাঁচ ডিগ্রি অক্ষাংশে যখন পৌঁছলাম তখন থেকেই গোলমাল আরম্ভ হল। এই অঞ্চলে ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে প্রবল বেগে বাতাস বইতে থাকে। ১৯ এপ্রিল থেকে বাতাসের বেগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল বিশেষ করে পশ্চিমা বাতাসটা। বাতাস নয় রীতিমোত ঝড়। ঝড়ের দাপাদাপি চলল শান্ত হল, ক্যাপটেন হিসেব করে বললেন আমরা আমাদের পথ থেকে তিন ডিগ্রি করে এসেছি। সমুদ্র এখন শান্ত কিন্তু আমার মন শান্ত হল না কারণ এদিককার সমুদ্র আমাদের জানা আছে, যে কোনো মুহূর্তে আবার ঝড় উঠতে পারে এবং আমরাও সেজন্যে প্রস্তুত হলাম। ভালোভাবে প্রস্তুত হতে না হতে পরদিনই ঝড় উঠল। ঝড় আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। এ ঝড়ের নাম দক্ষিণ মৌসুমী, সাদার্ন মনসুন। ঝড়ের বেগ বাড়বে আমরা জানি, জাহাজ সামলানো খুবই দুরূহ ব্যাপার। জাহাজে অনেক আকারের অনেক পাল আছে, সে সবের পৃথক নামও আছে। বাতাস অনুসারে সেসব পাল খাটাতে হয়, ওঠাতে হয়, নামাতে হয়, দারুণ পরিশ্রমের ব্যাপার এবং ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি না করতে পারলে যে কোনো সময়ে বিপদ আঘাত করবে। এর উপর মাস্তুল, হাল ও জাহাজের অন্যান্য অংশও সামলাতে হয়। সোজা কাজ নয়। তারপর আছে নাবিকদের মেজাজ। কখন কে কী মেজাজে থাকবে তা সেই নাবিক নিজেই জানে না। এসব তো গেল প্রাকৃতিক ব্যাপার তারপর ভয় আছে জলদস্যুদের। তারাও যে কখন কোন দিক থেকে এসে চড়াও হবে কে জানে।

যাহোক দক্ষিণ মৌসুমী ঝড় উঠল, আমাদের প্রচণ্ড বেগ দিতে লাগল। আহার নিদ্রা একরকম ত্যাগ করে জাহাজের পাল, হাল, মাস্তুল এই সব নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত রইলাম। তবুও জাহাজকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। আমাদের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাহাজ বাঁচানো, অতএব কোন দিকে যাচ্ছি জানি না।

ঝড় একদিন থামল। জাহাজখানা বেশ মজবুত ছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। ঝড় থামলেও বাতাসের বেগ আছে ফলে আমাদের জাহাজ তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। অনুমান করা হল আমরা বোধ হয় আমাদের পথ থেকে পাঁচশ লিগ সরে গেছি কিন্তু কোন সমুদ্রের কোথায় আছি তা আমাদের প্রবীণতম নাবিকও বলতে পারল না। আমাদের জাহাজে প্রচুর খাদ্য ছিল। অত পরিশ্রম সত্ত্বেও আমাদের সকলের স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল কিন্তু একটা সংকট দেখা দিল। পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। আর একটা সমস্যা আমরা এখন কোন দিকে যাব? সুরাটের পথে ফিরে যাবার চেষ্টা করাই উচিত কিন্তু কোথায় আছি তাই তো বুঝতে পারছি না, শেষে না বরফ জমা সমুদ্রে চলে যাই!

মাস্তুলের মাথায় একজন ছোকরাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ছে। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জনু তারিখে হাঁক দিল, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। সতের তারিখে আমরা বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলাম একটা মস্ত বড় দ্বীপের অংশ অথবা মহাদেশও হতে পারে (কারণ আমরা তখনো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না)। ঐ দ্বীপ বা দেশ থেকে লম্বা খানিকটা জমি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে এসেছে আর সমুদ্রের একটা খাঁড়ি ডাঙার ভিতর ঢুকে গেছে কিন্তু খাঁড়িটা গভীর নয়, একশ টনের উপর জাহাজ ভিতরে ঢুকতে পারবে না। আমরা এই খাঁড়ির এক লিগের মধ্যে নোঙর ফেললাম। ভিতরে যদি পানীয় জল পাওয়া যায় এজন্যে আমাদের ক্যাপটেন পাত্রসহ বারজন সশস্ত্র নাবিককে লম্বা নৌকোয় চাপিয়ে পাঠালেন। আমিও সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলাম, দেশটা একটু দেখতে চাই এবং যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারি সেই আশায়। নৌকো থেকে ডাঙায় নেমে আমরা ভিতরে এগিয়ে চললাম কিন্তু কোনো নদী বা ঝরনা এমন কি মানুষের কোনো বাসভূমিও আমাদের চোখে পড়ল না। অন্যান্য সকলে যখন সমুদ্রের উপকূলের দিকে গেল সেখানে যদি স্বাদু জল পাওয়া যায়, আমি তখন ভিতরের দিকে এগিয়ে চললাম। ভিতরে মাইলখানেক ঢুকে পড়লাম, মনে হল দেশটা অনুর্বর, পাথুরে। ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলাম এবং উল্লেখযোগ্য কিছু দেখা যাবে না অনুমান করে আমি খাঁড়ির দিকে ফিরতে লাগলাম। সমুদ্র বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আমি দেখলাম আমার সঙ্গী নাবিকেরা নৌকোয় উঠে পড়েছে এবং প্রাণপণে নৌকো চালিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে ছলছে। যদিও কোনো কাজ হত না তবুও আমি ওদের চিৎকার করে ডাকতে গেলাম আর তখনি দেখলাম বিশাল একটা প্রাণী দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে চলছে। প্রাণীটা এক হাঁটু জলে নেমে পড়েছে, লম্বালম্বা পা ফেলছে। আমাদের লোকেরা তখন তার থেকে আধ লিগ দূরে। জলের নিচে সুচালো পাথর থাকে, জলও গভীর হচ্ছে তাই প্রাণীটা আর এগিয়ে গিয়ে নৌকোটা ধরতে পারল না। এই ঘটনার বিবরণ আমি পরে শুনেছিলাম কিন্তু এখন যা ঘটছিল বা ঘটতে যাচ্ছে তা দাঁড়িয়ে দেখবার মতো আমার সাহস তখন ছিল না। যে দিক থেকে এসেছিলাম, আমি সেই দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম তারপর একটা উঁচু পাহাড়ে উঠে দেশটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দেখলাম সারা অঞ্চলেই

জমি চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি অবাক হলাম ঘাসের দৈর্ঘ্য লক্ষ করে। সম্ভবত গবাদি পশুর জন্যে যেগুলো আঁটি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলো অন্তত কুড়ি ফুট লম্বা।

পাহাড় থেকে নেমে আমি একটা বার্লি ক্ষেতের মাঝ-পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পথটা আমার কাছে বেশ চওড়া মনে হল কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের কাছে সেটা নিশ্চয় গলি পথ। এই পথ ধরে আমি হেঁটে চললাম কিন্তু উভয় দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শস্য দেখে মনে হল ফসল কাটার সময় হয়েছে। বার্লির শিষগুলো চল্লিশ ফুট উঁচুতে হাওয়ায় দুলছে। এক ঘণ্টা হাঁটার পর ক্ষেতের শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম। বেড়াগাছ দিয়ে ক্ষেতটি ঘেরা আর সেই বেড়া অন্তত একশ কুড়ি ফুট উঁচু হবে। বড় গাছগুলো যে কত উঁচু আমি তা হিসেব করতে পারলাম না। এই ক্ষেত থেকে পাশের ক্ষেতের মাঝে একটা বাঁধ কিন্তু তার ওপারে যাবার জন্যে ধাপ কাটা আছে। চারটে করে মোট ধাপ। একেবারে মাথায় আছে একটি পাথর। এই বাঁধ পার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ প্রতি ধাপ ছ ফুট উঁচু আর মাথার উপর পাথরটা কুড়ি ফুটের উপর তো হবেই। বেড়ার মাঝে কোনো ফাঁক আছে কিনা আমি খোঁজ করছি তখন দেখলাম অপর দিকের ক্ষেত থেকে এই দেশের একজন অধিবাসী ধাপকাটা বাঁধের দিকে এগিয়ে আসছে। খানিকটা আগে আমাদের নৌকো তাড়া করতে যে মানুষটাকে দেখেছিলাম এর আকারও তত বড়। লোকটা গির্জার চুড়োর সমান লম্বা হবে আর মনে হল এক একবার পা ফেলছে আর দশ গজ এগিয়ে আসছে। আমি যতটা অবাক হলাম ভয়ও পেলাম ততটা এবং বার্লি ক্ষেতের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। লোকটা তখন ধাপকাটা বাঁধের উপর উঠে পড়ে তার ডান দিকের ক্ষেতে ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন ডাকছে। গলার আওয়াজ কী? যেন আকাশ ফাটিয়ে ভেরি বাজছে। তার কান ফাটানো গালার আওয়াজ প্রথমে শুনে আমার মনে হয়েছিল যেন বাজ পড়ল। তার ডাক শুনে তারই মতো সাতটা দৈত্য এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে শস্য কাটবার কাস্তে, প্রতিটা কাস্তে আমাদের অন্তত ছটা কাস্তের সমান। প্রথম লোকটির মতো এই লোকগুলোর পরিচ্ছদে তফাত আছে, ওরা বোধহয় ওর ভৃত্য বা জন মজুর। কারণ প্রথম ব্যক্তির কথা শুনে আমি যে ক্ষেতে লুকিয়েছিলাম সেই ক্ষেতে বার্লি কাটতে এল। আমি যতদূর সম্ভব তাদের থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ক্ষেতে বার্লিগাছ এত ঘন যে আমি তাদের ফাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না। গাছের ফাঁক কোথাও কোথাও এক ফুটেরও কম, সেইটুকু ফাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি পালানো সম্ভব নয়। তবুও আমি চেষ্টা করে এগিয়ে চললাম এবং এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে বৃষ্টি ও হাওয়ার ফলে গাছগুলো মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ওই জায়গাটা পার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব তাছাড়া বার্লির শিষগুলো সুচালো আর গাছের পাশ ধারালো। নড়তে গেলে হাত পা কাটছে কিংবা শিষের খোঁচা লেগে জামাকাপড় ছিঁড়ছে। এদিকে আবার কয়েক জন জন-মজুর আমার পিছনে একশ গজের মধ্যে এসে গেছে। কী যে করি! পথশ্রম, দুঃখবোধ ও হতাশায় আমি ভেঙে পড়ছি। দুটো খাঁজের মধ্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে-গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে প্রাণে ভাবতে লাগলাম জীবন শেষ হয়ে যাক। আমি আমার হতভাগিনী বিধবা আর পিতৃহীন সন্তানদের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। হায়! আমি কী মূর্খ! বন্ধু ও

আত্মীয়দের পরামর্শ উপেক্ষা করে কেন আমি দ্বিতীয়বার সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম। মনের এই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় লিলিপুটদের কথা মনে পড়ল। আমাকে দেখে তারা ভেবেছিল এত বড় অতিকায় মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। সেদেশে একটা পুরো নৌবহর আমি আমার হাত দিয়ে টেনে এনেছিলাম এবং আর যেসব কাণ্ড কারখানা করেছি সেসব তো তাদের দেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে যা তাদের বংশধররা হয়তো বিশ্বাসই করবে না যদিও সারা লিলিপুট দেশ সেই অসম্ভব ঘটনার সাক্ষী। এই দৈত্যদের মধ্যে এসে আমি ভাবতে লাগলাম যে আমাদের মধ্যে মাত্র একট লিলিপুট দ্বীপবাসী ক্ষুদ্র প্রাণী যদি এসে পড়ত তাহলে তার যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হত এখন এই দৈত্যদের মাঝে পড়ে আমার সেই অভিজ্ঞতা হতে চলছে। লিলিপুটদের দেশে আমি কী বাহাদুরিই না দেখিয়ে এসেছি ভেবে আমার অনুতাপ হতে লাগল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে মানুষ তার দেহের অনুপাতে বর্বর ও নিষ্ঠুর হয় তাহলে আমি এই বিরাটকায় দৈত্যদের কাছে কী রকম ব্যবহার আশা করতে পারি? ওরা কেউ যদি আমাকে ধরে ফেলে? আমরা যেমন একটা ছোলার দানা গিলে ফেলতে পারি বা চিবিয়ে খাই ওরা তো আমাকে সেইভাবে খেয়ে ফেলবে। তবে দার্শনিকরা নাকি বলেন এই পৃথিবীতে তুলনা না করলে কিছুই বড় বা ছোটো নেই। লিলিপুটরাও হয়তো তাদের চেয়েও ক্ষুদ্র মানবিক প্রাণীর দেখা পেতে পারে, তাদের উপর কর্তৃত্বও করতে পারে। আজ যে বিরাট আকারের দৈত্যদের আমি দেখছি হয়তো এদের চেয়েও আরো বড় আকারের মানুষ আছে কোনো দেশে যে দেশ আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

আমি ভয় তো পেয়েইছি, হতবুদ্ধিও হয়ে গেছি, কী যে করব কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আমি যখন এই ভাবে নিজেকে নিয়ে বিব্রত সেই সময় সভয়ে দেখলাম, আমি যে খাঁজে আশ্রয় নিয়েছি তার দশ গজের মধ্যে একটা দৈত্য এসে পড়েছে। আমার ভয় হল ও পরের ধাপে বোধহয় আমাকে মাড়িয়ে ফেলবে কিংবা ওর কাস্তে দিয়ে আমাকে দুটুকরো করে ফেলবে। ও কী করল তা হয়তো আমি জানতেও পারব না। প্রাণভয়ে ভীত হলেও যখন দেখলাম দৈত্যটা পা তোলবার উপক্রম করছে আমি তখন প্রাণপণে জোরে চিৎকার করে উঠলাম। আমার চিৎকার দৈত্যের কানে পৌঁছল, সে দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। ভাবছি আবার চিৎকার করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি না, এমন সময়ে দৈত্যটা আমাকে দেখতে পেল। আমকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল না, কী ভাবল। অনেক সময় ক্ষুদ্র প্রাণী বা কীট পতঙ্গরা দংশন করে বা হুল ফুটিয়ে দেয় তো! স্বদেশে আমার নিজেরই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে তার তর্জনি ও বুড়ো আঙুল দিয়ে আমাকে টপ করে তুলে নিল এবং তিন গজ আন্দাজ দূরে ধরে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। আমার চিৎকারটা তার কাছে বোধহয় ওদের নিজেদের মতোই মনে হয়েছিল যদিও ওদের কণ্ঠস্বরের তুলনায় মৃদু। তাই আমাকে তুলে নিয়ে আমার আকার প্রকার লক্ষ করতে লাগল। ওর হাতে আমি তখন মাটি থেকে অন্তত ষাট ফুট উঁচুতে। ওর আঙুলের চাপে আমার দুদিকের পাঁজরে ব্যথা লাগছিল। পাছে আঙুল ফসকে পড়ে যাই এই জন্যেও বোধহয় আমাকে ঈষৎ জোরে ধরে রেখেছিল, যাহোক আমি ঠিক করলাম এ অবস্থায় হাত পা নাড়া ঠিক হবে না কারণ এখান থেকে পড়লে হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে।

আমি সাহস করে সূর্যের দিকে চাইলাম। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত জড়ো করে করুণ স্বরে আমার বিপজ্জনক অবস্থার কথা নিবেদন করলাম। কারণ আমার ভয় হচ্ছিল দৈত্যটা আমাকে হয়তো আছড়ে মাটিতে ফেলে দেবে ঠিক আমরা যেভাবে বাজে ক্ষুদ্র প্রাণীকে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেলি। আমার গ্রহ বোধহয় আমার অনুকূলে। দৈত্যটা আমার কণ্ঠস্বর শুনে ও হাত পা নাড়া দেখে কৌতূহলী হল এবং আমার ভাষা না বুঝলেও তাদের মতো কথা বলছি এটুকু বোধহয় সে বুঝতে পারল ইতোমধ্যে আমার দুপাশে যন্ত্রণা হচ্ছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে। আমি আমার দুই পাশে চেয়ে দৈত্যকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম যে আমার ভীষণ লাগছে, অত চেপে ধরো না। দৈত্যটা বোধহয় আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারল, সে আমাকে তার জামার একটা খাঁজে বসিয়ে দিল এবং আমাকে সেইভাবে নিয়েই তার মনিবের দিকে ছুটল। মনিব একজন সঙ্গতিসম্পন্ন চাষী আর এই দৈত্যটাকেই আমি প্রথমে ক্ষেতে দেখেছিলাম।

চাষী-মনিব তার মজুরের কাজ থেকে আমার বিষয়ে শুনল। (ওদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে আমার তাই মনে হচ্ছিল)। মনিব আমাদের ছড়ির আকারে একটা শুকনো খড় তুলে নিল তারপর সেইটের ডগা দিয়ে আমার জামা তুলল। জামাটা যে পোকার আবরণের মতো নয় ও বোধহয় তাই দেখতে চাইল। ফুঁ দিয়ে আমার মাথার চুল উড়িয়ে দেখল তারপর আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আমার চোখ মুখ ভালো করে দেখতে লাগল। সে তার শ্রমিকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করল। (পরে আমি জানতে পেরেছিলাম) যে ক্ষেতে আমার মত খুদে প্রাণী তারা আর দেখেছে কি না। তারপর সে আমার পিঠের দিক ধরে আমাকে আস্তে আস্তে আমার দুই পা ও দুই হাতের উপর নামিয়ে দিল। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে, আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে ও পিছিয়ে হেঁটে তাদের বুঝিয়ে দিলাম আমার পালিয়ে যাবার কোনো মতলব নেই। তারা সকলে আমাকে ঘিরে বসে আমার নড়াচড়া ভালো করে দেখতে লাগল। আমি আমার মাথার টুপি খুলে কোমর বেঁকিয়ে মনিবকে অভিবাদন জানিয়ে হাঁটু ও মুখ তুলে নিবেদনের ভঙ্গিতে যত জোরে সম্ভব কয়েকটা কথা বললাম, তারপর স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলি পকেট থেকে বার করে সবিনয়ে তাকে উপহার দিলাম। থলিটি সে হাতে তুলে নিয়ে চোখের কাছে তুলে ধরে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল, জিনিসটা কী? জামার হাতা থেকে একটা পিন বার করে থলেটা খুঁচিয়ে দেখল কিন্তু বুঝতে পারল না। তখন আমি তাকে ইশারা করে হাত নামাতে বললাম। হাত নামালে আমি তার হাত থেকে থলেটা নিয়ে সেটা খুলে স্বর্ণমুদ্রাগুলো বার করে তার হাতে দিলাম। স্পেন দেশের চার পিস্টোলের ছটি মুদ্রা এবং বিশ তিরিশটা ছোটো মুদ্রা ছিল। মনিব মশাই কড়ে আঙুলটা জিভের ডগে ভিজিয়ে সবচেয়ে বড় মুদ্রাটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল কিন্তু এগুলো কী হতে পারে তা সে বুঝতে পারল না। সে আমাকে ইশারা করল মুদ্রাগুলো আবার থলের মধ্যে ভরে দিতে এবং থলেটি আমার পকেটে রাখতে। তবুও আমি থলেটি তাকে আবার দিতে চাইলাম কিন্তু যখন গ্রহণ করল না তখন সেটি আমার পকেটে রাখাই ভালো মনে করলাম।

চাষী এতক্ষণে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে যে আমি বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন একটি জীব। সে আমার সঙ্গে অনেক কথাই বলতে লাগল কিন্তু কী জোর আওয়াজ! আমার কান বুঝি ফেলে যাবে। যদিও তার কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না তবুও সে যে একটা

ভাষা অনুসরণ করছে তা বোঝা গেল। আমি একাধিক ভাষায় তার কথার জবাব দেবার চেষ্টা করছিলাম যতদূর পারি চিৎকার করে। আর সেও তার কান আমার মুখের দুই তিন গজের মধ্যে নিয়ে আসছিল। কিন্তু বৃথা। কারণ আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারছিলাম না। এরপর সে তার মজুরদের কাজে পাঠিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করল। রুমালটা দুভাঁজ করে মাটিতে রেখে নিচু হয়ে আমাকে রুমালের উপর নামবার জন্যে ইশারা করল। আমাকে যেখানে রেখেছিল সেখান থেকে দুফুটখানেক মতো লাফিয়ে আমি সহজেই রুমালের উপর নেমে পড়লাম। আমি চিন্তা করলাম ওর আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। আমি রুমালের উপর শুয়ে পড়লাম আর চাষী রুমালের চারটে কোণ তার আঙুল দিয়ে জড়ো করে আমাকে তুলে নিল আর সেই ভাবে আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে চলল। বাড়ি ফিরে সে তার বউকে ডেকে আমাকে দেখাল। কিন্তু ইংল্যান্ডের মেয়েরা যেমন ব্যাঙ বা মাকড়সা দেখে চিৎকার করে ভয় পেয়ে পালায় চাষী বউও তেমনি আমাকে দেখেই ছুটে পালাল। যাহোক দূর থেকে আমার ব্যবহার ও ওর স্বামীর ইশারা অনুসারে আমাকে কাজ করতে দেখে বৌটি আশ্বস্ত হল এবং ক্রমশ আমার প্রতি তার মনোভাব কোমল হল। বেলা প্রায় বারটার সময় একজন ভৃত্য দুপুরের আহার নিয়ে এল। এক ডিশ মাংস (একজন কর্মী চাষীর জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ) এনেছে, সেই ডিশটির ব্যাস চব্বিশ ফুট প্রায়। পরিবারের মানুষ হল চাষী ও তার বউ, তিনটে বাচ্চা আর বৃদ্ধ দাদীমা। ওরা টেবিল ঘিরে বসল, চাষী আমাকে টেবিলের এক পাশে বসিয়ে দিল, টেবিলটা তিরিশ ফুট উঁচু। এত উঁচু টেবিল, আমি ভয়ে ভয়ে কিনারা থেকে যতটা পারি দূরে সরে বসলাম। পড়ে যাবার ভয় আছে তো! চাষী বউ এক টুকরো মাংস নিয়ে সেটা কুঁচি কুঁচি করে কেটে আর কিছু রুটি ছোটো ছোটো টুকরো করে একটা কাঠের প্লেটে দিয়ে আমার সামনে রাখল। আমি মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে আমার ছুরি কাঁটা বার করে খেতে আরম্ভ করলাম। আমাকে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে দেখে ওরা খুব মজা অনুভব করতে লাগল। চাষী বউ তার দাসীকে বলল ওষুধ খাবার ছোটো গেলাস আনতে। ওদের ছোটো গেলাস আমার কাছে মস্ত বড়। বউ তাতে সুরা ঢেলে দিল, তা প্রায় দু'গ্যালন হবে। অনেক কষ্টে দুহাত দিয়ে সেই পাত্র ধরে ও শ্রদ্ধা সহকারে যতদূর সম্ভব উচ্চস্বরে ইংরেজিতে আমি চাষী-বউয়ের স্বাস্থ্য কামনা করে সুরা পান করতে আরম্ভ করলাম। আমার কথা বলার ও পান করবার ভঙ্গি দেখে ওরা এত জোরে হেসে উঠল যে আমার কানে তালা ধরে গেল। সুরার স্বাদ ভালো, অনেকটা আমাদের সাইডায়ের মতো। পান শেষ হলে চাষী আমাকে ইশারা করে তার ডিশের কাছে যেতে বলল। টেবিলের উপর দিয়ে যেতে যেতে আমি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম তবে আঘাত পাই নি। আমি তৎক্ষনাৎ উঠে পড়লাম। লক্ষ করলাম যে আমি পড়ে যাওয়াতে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি সৌজন্যে জানাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আমার টুপি বার করে মাথার উপর নাড়তে নাড়তে তিনবার আনন্দসূচক ধ্বনি করে ওদের জানিয়ে দিলাম যে পড়ে গিয়ে আমার কোনো চোট লাগে নি। তারপর আমি যখন আমার কর্তা মশাইয়ের (এখন থেকে আমি চাষীকে কর্তামশাই বলব) দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তার সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি যে কর্তার পাশেই বসেছিল এবং দেখেই মনে হয় দুষ্টু সে আমার পা ধরে টপ করে এত উঁচুতে তুলে ধরল যে আমি তো

ভয়েই সারা। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। কিন্তু তার বাবা চট করে আমাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এত জোরে ছেলেটার কান মলে দিল যে সেই জোর প্রয়োগ করলে ইউরোপের এক দল ঘোড়া একেবারে কাৎ হয়ে যেত। কর্তা বলল, ছেলেটাকে টেবিল থেকে তুলে নিতে। সাজা পেয়ে বালকটি আমার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করল। কিন্তু ছেলেরা অমন একটু দুষ্টু হয়। আমাদের ছেলেরাও চড় ই, খরগোস, বেড়াল বা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে দুষ্টুমি করে। তাই আমি হাঁটু গেড়ে কর্তা মশাইকে ইঙ্গিতে অনুরোধ করলাম এবারের মতো বাচ্চাটাকে ক্ষমা করুন। বাবা আমার অনুরোধে ছেলেটিকে আবার তার চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আমি খুশি হয়ে এগিয়ে গিয়ে কর্তার হাতে চুম্বন করলাম, কর্তাও আমার হাতে চাপ দিয়ে জানালেন যে তিনি খুশি হয়েছেন।

ডিনার চলার সময় আমার কর্ত্রীর প্রিয় বেড়ালটি তাঁর কোলে উঠে বসল। আমি আমার পিছন দিকে একটা অচেনা আওয়াজ শুনলাম, যেন একডজন কারিগর তাদের মেসিনে মোজা বুনছে কিন্তু তা নয়। আওয়াজের উৎস হল সেই বিড়াল, সে গজরাচ্ছে। বিড়ালের মাথা আর থাবা দেখে অনুমান করলাম যে সেটি আমাদের একটি ষাঁড়ের চেয়ে তিনগুণ বড়। কর্ত্রী বিড়ালটিকে আদর করতে করতে খাচ্ছিলেন। যদিও আমি টেবিলের অপর প্রান্তে, বিড়ালটি থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে ছিলাম তবু পাছে বিড়ালটি সহজে লাফিয়ে উঠে আমাকে আঁচড়ে দেয় এজন্যে কর্ত্রী জীবটিকে শক্ত করে ধরে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তার মুখ দেখে আমার বেশ ভয় করতে লাগল। বিড়ালটিকে আমি ভয় না করলেও পারতাম কারণ যখন কর্তা আমাকে তুলে বিড়ালটার তিন গজের মধ্যে আমাকে বসিয়ে দিল তখন বিড়াল আমার দিকে চেয়েও দেখল না। আমি আমার ভ্রমণের সময় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে দেখেছি যে কোনো হিংস্র জন্তুকে দেখে ভয় পেলে বা পালাতে থাকলে তাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয় এবং তখন সে আক্রমণ করে বা তাড়া করে। অতএব আমি এমন ভাব দেখালাম যে বিড়ালকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। তার মাথার কাছে পাঁচ ছ'বার ঘুরেও এলাম। এমন কি তার কাছে আধ গজের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে এমন ভাব দেখালাম যেন ওকে গ্রাহ্য করি না। দেখি কি বিড়াল মশাই নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, ও যেন আমাকেই বেশি ভয় পাচ্ছে। চাষীদের বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে, তিন চারটে কুকুর ঘরে ঢুকল। কুকুরকে আমার তেমন ভয় নেই। একটা মাস্টিফ কুকুর ছিল, চারটে হাতির সমান। একটা গ্রে-হাউন্ডও ছিল। সেই মাস্টিফের চেয়ে লম্বা হলেও আকারে ছোটো।

ডিনার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন বছর খানেক বয়সের একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নার্স ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখেই তো বাচ্চা বায়না ধরল–বাচ্চাদের যা স্বভাব–সে আমাকে চায়, ভেবেছে নতুন কোনো খেলনা বুঝি। শেষে চিৎকার আরম্ভ করল। সেই চিৎকার লন্ডন ব্রিজ থেকে চেলসি পর্যন্ত শোনা যাবে। মা তো ভালোবেসে আমাকে তুলে বাচ্চার কাছে নামিয়ে দিতেই সে আমার কোমর টিপে ধরে তুলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা তার হাঁ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ভয়ে পেয়ে আমি তো প্রাণপণে এত জোরে চিৎকার করে উঠলাম যে বাচ্চাও ভয় পেয়ে আমাকে ফেলে দিল। ভাগ্যিস মা তার এপ্রনটা তুলে ধরেছিল নয়তো নিচে পড়ে গেলে আমার ঘাড়টা নিশ্চয়ই মটকে যেত। ওদিকে বাচ্চার কান্না থামাবার জন্যে তার নার্স বাচ্চার কোমরে আটকানো

একটা ডুগডুগি বাজাতে লাগল। কিন্তু বাচ্চা কিছুতেই থামে না তখন নার্স বাধ্য হয়ে ওকে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল। আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে নার্সের ঐ শরীর দেখে আমি যত রিবক্ত হয়েছিলাম এমন বিরক্ত আর কখনো হই নি। নার্সের শরীরের গঠন আকার ও রং আমি কীসের সঙ্গে তুলনা করব তা বলতে পারছি না। মাপলে বিরাট হবে। সারা শরীর দাগ ও ফুসকুড়িতে ভর্তি বিশ্রী দেখতে। এত বলতে পারছি কারণ আমি তো ওর কাছেই টেবিলে দাঁড়িয়ে দিলাম, সবই ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে পড়ল আমাদের ইংরেজ মহিলাদের শুভ্র ও সুন্দর শরীরের কথা, অবশ্য তারা আমাদেরই আকারের। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তাদের ত্বক দেখলে তবে তার ত্রুটি ধরা পড়ে, নইলে নয়।

আমি লিলিপুট দ্বীপে দেখেছি ওদের গায়ের রং ভারী চমৎকার, এমন আমি আর দেখি নি। ঐ দ্বীপে আমার এক পণ্ডিত বন্ধু বলেছিল যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে যখন আমার মুখের দিকে তাকায় তখন আমার মুখ খুব ফর্সা ও ত্বক মসৃণ দেখায়। কিন্তু আমি তখন তাকে হাতে করে তুলে আমার মুখের কাছে নিয়ে এলাম তখন সে স্বীকার করল কাছ থেকে মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না। সে বলল আমার মুখে অনেক গর্ত, দাড়ির গোড়াগুলো শুয়োরের লোমের চেয়ে দশগুণ মোটা আর মুখের রঙ ও নানা বর্ণের মিশ্রণ যা মোটেই ভালো বলা চলে না। অবশ্য আমার দেশে অন্যান্য পুরুষদের মতোই আমার রঙ ফর্সা আর ঘুরে বেড়ালেও চামড়া রোদে বেশি পোড়ে নি। অথচ আমার সেই বন্ধু বলেছিল তাদের দেশের মেয়েদের অনেক ত্রুটি আছে। যেমন কারো মুখে বিন্দু বিন্দু বাদামি ছোপ আছে. কারো হাঁ-মুখ বড়, নাক থ্যাবড়া কিন্তু এসব ত্রুটি আমার চোখে পড়ত না কারণ আমিও তাদের দেখছি অনেক দূর থেকে। সেই হিসেবে বলতে পারি নিকট থেকে দেখে এই দৈত্যদের আমি যে ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার পাঠকদের মনে হতে পারে ওরা বুঝি কুৎসিত কিন্তু তা নয়। ওরা রূপবান না হতে পারে কিন্তু সুদর্শন। আমার কর্তা চাষী হলেও আকার অনুসারে তার দেহের গঠন ও মুখশ্রী উত্তম।

ডিনার শেষ হল। কর্তা আবার কাজে বোরোবেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও হাত পা নাড়া দেখে বুঝলাম তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলছেন আমার দিকে যেন কড়া নজর রাখা হয় এবং যত্ন নেওয়া হয়। আমি ভীষণ ক্লান্ত, ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। আমার কর্ত্রী তা বুঝতে পেরে আমাকে তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং পরিষ্কার একটি রুমাল ঢাকা দিলেন। রুমালটি আমাদের মানোয়ারি জাহাজের পালের চেয়ে বড় ও মোটা। আমি প্রায় দুঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম আমি যেন আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী ও বাচ্চাদের সঙ্গে রয়েছি। বেশ ভালো লাগছিল কিন্তু ঘুম ভেঙে যেতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এখানে আমি একা। দু'শ থেক তিনশ ফুট চওড়া একটা মস্ত বড় ঘরে শুয়ে আছি। ঘরটা দু'শ ফুট উঁচু। আার যে খাটে শুয়ে আছি সেটা কুড়ি গজ চওড়া। কর্ত্রী মহিলা তার সাংসারিক কাজে যাবার আগে আমার ঘরে তালা লাগিয়ে গেছেন। মেঝে থেকে খাটটা আট গজ উঁচু। কিছু প্রাকৃতিক কাজ সারবার জন্যে খাট থেকে নিচে নামা দরকার অথচ দরজা খোলবার জন্যে কাউকে ডাকাও যাচ্ছে না কারণ যদি ডাকাডাকি করি তাহলে আমি যত জোরেই চিৎকার করি না কেন আমার ডাক অতদূরে রান্নাঘরে পৌঁছবে না। আমার যখন এইরকম অবস্থা তখন পর্দা বেয়ে দুটো ইঁদুর উঠে এল তারপর

সে দুটো খাটে নেমে এল। একটা আমার মুখের কাছে এসে গেল। আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, উঠে দাঁড়িয়ে আমার ছোরাখানা বার করলাম। ওরা আমার মতো একটা ক্ষুদে প্রাণীকে ভয় করবে কেন? ভয়ংকর প্রাণী দুটো আমাকে দুদিক থেকে তেড়ে এল। একটা ইঁদুর তো তার একটা পা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল কিন্তু সে ব্যাটা আর কিছু করার আগেই আমি আমার ছোরা দিয়ে ওর পেটটা চিরে দিলাম। ইঁদুরটা আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। অপর ইঁদুরটা সঙ্গীর দুরবস্থা দেখে পালাল কিন্তু পালাবার আগে আমি ওর পিঠে ছোরা দিয়ে আঘাত করলাম। সেখান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। দম নেবার জন্যে এবং সাহস ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি খাটের উপর পায়চারি করতে লাগলাম। এই ইঁদুরগুলো আমাদের এক একটা মাস্টিফ কুকুরের সমান কিন্তু আরো চঞ্চল ও হিংস্র। আমি ছোরা সমেত আমার বেলটি খুলে যদি ঘুমিয়ে পড়তাম তাহলে তো ওরা আমাকে এতক্ষণে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত তারপর বেমালুম খেয়ে ফেলত। মরা ইঁদুরটার লেজ মাপলাম, এক ইঞ্চি কম দু'গজ। সেটাকে খাট থেকে সরাতে গিয়ে দেখি ব্যাটা তখনো বেঁচে আছে। ছোরা দিয়ে গলায় আবার কয়েকটা আঘাত করতেই শেষ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্রী মহিলা ঘরে ঢুকে আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে নিজের হাতে তুলে নিলেন। আমি মরা ইঁদুরটাকে দেখিয়ে দিলাম এবং নানাভাবে যখন বুঝিয়ে দিলাম যে আমার কোনো আঘাত লাগে নি তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, মুখে হাসি ফুটল। তারপর তিনি পরিচারিকাকে ডাকলেন, সে একটা চিমটে এনে ইঁদুরটাকে তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। কর্ত্রী আমাকে টেবিলে বসিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে আমার রক্তমাখা ছোরাখানা দেখিয়ে আমার জামায় মুছে খাপে ভরে রাখলাম। এরপর আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেই প্রাকৃতিকে কাজটা আমার হয়ে কেউ করে দিতে পারবে না তাই আমি তাকে ইশারায় বললাম আমাকে নিচে নামিয়ে দিতে। কিন্তু যা করতে চাই তা মহিলাকে বলতে শালীনতায় বাধল। তাই আর কিছু না বলে বাইরে বেরোবার দরজা দেখালাম আর সেই সঙ্গে কোমর বেঁকিয়ে কয়েকবার অভিবাদন জানালাম। প্রথমে তার বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল তারপর আমাকে হাতে তুলে নিয়ে বাইরে এসে বাগানে নামিয়ে দিলেন।

দু'শ গজ দূরে একটা জায়গা বেছে নিয়ে মহিলাকে কাছে আসতে বা দেখতে নিষেধ করে আমি দুটো সরেল পাতার আড়ালে নিজেকে ভারমুক্ত করলাম।

আমি আশা করি আমার সহৃদয় পাঠকরা এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে খুঁটিনাটি লেখার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। এগুলো অবশ্যই তুচ্ছ এবং নিচুমনা ব্যক্তিদের কাছে এগুলো অশ্লীল মনে হবে তথাপি এগুলো দার্শনিকের ভাব ও কল্পনা প্রসারিত করতে হয়তো সাহায্য করবে এবং ব্যক্তি হিসেবে সাধারণ একজন মানুষকে কতরকম সমস্যায় পড়তে হয় তা জেনে তাঁরা হয়তো এইসব অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো কাজে লাগাতে পারেন। এইজন্যেই আমি কোনো আড়ম্বর বা অলংকার যোগ না করে সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় আমার ভ্রমণ কাহিনীর সত্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই ভ্রমণ কাহিনী আমার মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে আমি কোনো ঘটনাই বিস্মৃত হই নি, তাই লেখবার সময় কিছুই বাদ দিই না শুধু যেগুলো পাঠকদের একঘেয়ে মনে হতে

পারে বা বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে সেইগুলো ছাড়া। যদিও ভ্রমণকারীরা তাদের সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[চাষীর কন্যার বিবরণী। লেখককে প্রথমে বাজারে পরে নগরে নিয়ে যাওয়া হল। ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিবরণী।]

আমার কর্ত্রী মহিলার ন'বছরের একটি কন্যা আছে। কন্যাটি বয়সের তুলনায় কিছু পাকা; চমৎকার সেলাই করতে পারে, খেলার পুতুলটির নিপুণ হাতে সাজাতে পারে। সেও তার মা স্থির করল ইঁদুরের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে শিশুদের দোলনায় আমাকে রাত্রে শোয়ানো হবে। একটা ক্যাবিনেটের ড্রয়ার বার করে নিয়ে দোলনাটি তার মধ্যে রাখা হল এবং দোলনা সমেত ড্রয়ারটি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। আমি যতদিন এই পরিবারে ছিলাম ততদিন এইটিই আমার শয্যা ছিল তবে যখন আমি ওদের ভাষা শিখতে লাগলাম তখন আমার অসুবিধা বলতে থাকায় ওরা দোলনটির অনেক উন্নতি সাধন করে দিয়েছিলেন। এই মেয়েটি ভারী চমৎকার, প্রায়ই আমার কাছে থাকত, আমার অনেক কাজ করে দিত। আমি কয়েকবার ওর সামনে পোশাক পরিবর্তন করেছিলাম। ও তা দেখেছিল তাই আমাকে ও কয়েকবার পোশাক ছাড়িয়ে অন্য পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল। আমি অবশ্য এ কাজটি তাকে করতে দিতাম না তবে সে আমার একটা কাজের কাজ করে দিয়েছিল। সে আমাকে সাতটা শার্ট তৈরি করে দিয়েছিল। যতদূর সম্ভব মোলায়েম কাপড় সে বেছে নিয়েছিল তবুও তা আমাদের থলের কাপড়ের চেয়েও মোটা। শার্টগুলো সে নিজেই কেচে দিত। সে আমার শিক্ষয়িত্রীও কারণ সে আমাকে ওদের ভাষা শেখাত। আমি আঙুল দিয়ে কোনো জিনিস দেখালে সে নিজের ভাষায় তার নামটা বলে দিত অতএব ভবিষ্যতে আমার প্রয়োজন মতো কিছু চেয়ে নিতে পারতাম। মেয়েটির মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। তার উচ্চতা এখন চল্লিশ ফুট, বয়স অনুসারে আরো একটু বেশি হওয়া উচিত ছিল। সে আমার নামকরণ করল 'গ্রিলড্রিল'। তার পরিবারের সকলে আমাকে এই নামে ডাকত, পরে সারা দেশ। শব্দটি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে। ইংরেজি করলে হয়তো অর্থ হবে 'ছোটো মানুষ'। ওদেশে আমি ওরই জন্যে বাস করতে পেরেছিলাম এবং যতদিন ওদেশে ছিলাম ততদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি। আমি ওকে গ্লামডালক্লিচ নামে ডাকতাম যার অর্থ ক্ষুদে নার্স। সে আমাকে ভালোবেসে যেভাবে আমার যত্ন করেছিল তা আমি স্বীকার না করলে আমি অকৃতজ্ঞ। আমিও যথাসাধ্য প্রতিদান দেবার চেষ্টা করতাম।

কথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিবেশীদের কাছে আমি আলোচ্য হয়ে পড়লাম। আমার কর্তা তার ক্ষেতে একটা অদ্ভুত জীব কুড়িয়ে পেয়েছেন, একটা এসপ্ল্যাকনাকের চেয়ে বড় নয়, জীবটি সর্বাংশে আমাদেরই মতো মানুষ, সব বিষয়ে আমাদের অনুকরণ করতে পারে, ওর নিজেরও একটা ভাষা আছে, আমাদের ভাষাও কিছু শিখেছে, দু পায়ে সোজা হাঁটে, ধীর ও স্থির, ডাকলেই কাছে আসে, অঙ্গপ্রসঙ্গ সুগঠিত, অমনটি দেখা যায়

না আর গায়ের রঙ। অভিজাত পরিবারের তিন বৎসরের মেয়েটির চেয়ে ফর্সা। আমার কর্তার বন্ধু প্রতিবেশী এক চাষী কথাটা শুনে একদিন সত্য মিথ্যা যাচাই করতে এল। আমাকে তখনি তার সামনে হাজির করা হল। আমার কর্তা আমাকে টেবিলের উপর তুলে দিল। আমাকে আদেশ করতেই আমি টেবিলের উপর হাঁটতে লাগলাম এবং তারপর খাপ থেকে আমার লম্বা ছোরাখানা বার করে দুচারবার ঘুরিয়ে আবার খাপে পুরে রাখলাম, তারপর আমার বন্ধু গ্লামডালক্লিচের নির্দেশ অনুসারে কর্তার অতিথিকে তাদেরই ভাষায় অভ্যর্থনা জানালাম। এই আগন্তুকের বয়স হয়েছিল। চোখে কম দেখে তাই সে পকেট থেকে চশমা বার করে পরল। তাই দেখে আমি হো হো করে হেসে উঠলাম কারণ তার চোখ দুটো দেখাচ্ছিল যেন দুটো জানালায় দুটো চাঁদ। আমাকে ভালো করে দেখবার জন্যেই চশমা পরলেন। আমাদের বাড়ির লোকেরা আমার হাসির কারণ বুঝতে পারল কিন্তু আগন্তুক নিরর্থক আমার উপর চটে গেল। লোকটি কৃপণ স্বভাবের, পয়সা রোজগারের দিকে তার নজর। সে আমার কর্তার কাছে বলল পাশের শহরে ওকে নিয়ে যাও সেখানে ওকে দেখিয়ে দুপয়সা রোজগার করতে পারবে। শহরটা বেশি দূরে নয়, আমাদের বাড়ি থেকে বাইশ মাইল, ঘোড়ায় চেপে গেলে আধঘণ্টা সময় লাগবে। আমার সন্দেহ হল কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমি লক্ষ করলাম যে আমার কর্তা এবং আগন্তুক দুজনে মিলে ফিস ফিস করে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। আমি তাদের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তবে আমি পরদিন সকালে সব জানতে পারলাম। আমার ক্ষুদে নার্স গ্লামডালক্লিচ আমাকে সবকিছু বলল। ব্যাপারটা সে চালাকি করে তার মায়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। বেচারি গ্লাম! সে আমাকে তার বুকের উপর তুলে নিল আর এমন ভাবে কাঁদতে লাগল যেন সেই দোষী। সে আশঙ্কা করছে যে ঐ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকগুলো আমার ক্ষতি করবে, আমাকে নিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করবে যে তাদের টেপনটাপনে হয় আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব নয়তো আমার হাত পা একটা কিছু ভাঙবে। সে বলতে লাগল যে আমি বিনয়ী ও নম্র। নিজের সম্মান রাখতে জানি আর সেই আমাকে নিয়ে ওরা ছেলেখেলা করবে, আমার চূড়ান্ত অপমান করে ছাড়বে। শুধু কিছু অর্থের লোভে আমাকে কতকগুলো বাজে গ্রাম্য মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে, কী বিশ্রী। সে বলতে লাগল যে তার বাবা আর মা কথা রাখে না, তারা বলেছিল গ্রিলড্রিল আমার। কিন্তু এখন ওরা কথা রাখছে না। গত বছরে ওরা এমন ভান করলে যে একটা ভেড়ার বাচ্চা আমাকে দিয়েই দিল কিন্তু সেটা যেই বড় হল আর মোটা হল অমনি সেটা একটা কসাইকে বেচে দিল। আমার নার্স এত দুঃখ প্রকাশ করলেও আমি বুঝলাম আমার কিছু করার নেই, ওরা যা করবে তা আমাকে মেনে নিতেই হবে তবে আমার আশা আমি একদিন মুক্তি পাবই। এদের হাতে যতদিন থাকব ততদিন আমি কিছু করতে পারব না এমন কি ইংল্যান্ডের রাজা এদের হাতে পড়লে তাঁকেও এইসব বিড়ম্বনা সহ্য করতে হত।

পাশেই একটা শহরে হাট বসে। আমার কর্তা তাঁর বন্ধুর পরামর্শে আমাকে হাটে নিয়ে যাবেন। তিনি আমাকে একটা বাক্সের মধ্যে ভরলেন, সঙ্গে আমার ক্ষুদে নার্সকেও নিলেন। সে আমার পিছনে বসল। বাক্সটা চারদিকে বন্ধ তবে আমাকে ভিতর থেকে বাইরে বের করবার জন্যে একটা দরজা আছে আর বায়ু চলাচল করবার জন্যে বাক্সের

গায়ে কয়েকটা ছোটো ছোটো গর্ত করা আছে। আমার যাতে না কষ্ট হয় সেজন্যে গ্লাম তার পুতুলের বিছানার একটা তোষক বাক্সের মধ্যে বিছিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছে করলে আমি তার উপর শুতেও পারি। গ্লাম আমাকে আরাম দেবার চেষ্টা করলে কী হবে। গাড়ির সে কি ঝাঁকানি। ঝড়ের সময় জাহাজেও এরকম বা এমন ঘন ঘন ঝাঁকানি খেতে হয় না। বিরাট ঘোড়া, পা ফেলছে চল্লিশ ফুট পর পর। যদিও আধঘণ্টার যাত্রা তবুও ঐ সময়ের মধ্যে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। পথ বেশি নয়, লন্ডন থেকে সেন্ট অ্যালবানস যতটা দূর অতটা দূর হবে। কর্তা একটা সরাইখানার সামনে দাড়ি দাঁড় করালেন। এখানে উনি মাঝে মাঝে আসেন। কর্তা সরাইওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, আমার জন্যে একজন ঘোষক দরকার যে হাটে ও শহরে চিৎকার করে বলবে, একটি অদ্ভুত জীব পাওয়া গেছে, যদি দেখতে চাও তো গ্রীন ঈগল-এ চলে এস। জীবটি আকারে একটি এসপ্লাকনাকের (ও দেশের সুন্দর একটি পশু প্রায় ছ'ফুট লম্বা) চেয়ে বড় নয় কিন্তু দেখতে ঠিক মানুষের মতো, কথা বলতে পারে এবং নানা ক্রীড়াকৌশল দেখাতে পারে। এছাড়া ঐ ঘোষক আমাকে জনসাধারণকে দেখবার জন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাও করবে। এইরকম একজন লোক পাওয়া গেল।

সরাইখানার সবচেয়ে বড় ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। ঘরখানা লম্বা ও চওড়ায় দুদিকে তিনশ ফুট। আমার ক্ষুদে নার্স আমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে এবং দর্শকদের সামনে কী দেখাব বা করব তার তালিম দেবার জন্যে টেবিলের পাশে একটা নিচু টুলে উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে অযথা ভিড় না বাড়াবার জন্যে এবং যাতে আমার অসুবিধা না হয় সেজন্যে কর্তা ঠিক করলেন একসঙ্গে তিরিশজনের বেশি লোক ঘরে ঢোকানো হবে না। আমার ক্ষুদে বান্ধবী আমাকে টেবিলের উপর বিশেষ কায়দায় হাঁটতে বলল। আমি তাই হাঁটলাম তারপর আমি যাতে বুঝতে পারি ওদের এমন ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। আমিও যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে সেগুলোর উত্তর দিতে থাকলাম। দর্শকরা ঘরে আসবার পর আমি বেশ কয়েকবার ঘুরেফিরে তাদের অভিবাদন জানালাম, বললাম তোমরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর, তোমরা স্বাগতম, ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দিলাম। সেলাই করবার সময় গ্লাম আঙুলে যে টুপি পরত, সুরা পান করাবার জন্যে সেইরকম একটা টুপি সে আমাকে দিয়েছিল। আমি তাতে সুরা ঢেলে দর্শকের সামনে পান করলাম। তারপর খাপ থেকে আমার লম্বা ছোরা বার করে ইংরেজদের মতো ওদের কিছু কসরৎ দেখালাম। সেদিন বার দল দর্শককে আমার কলা কৌশল দেখাতে হল। কোনোবার কম কোনোবার বেশি এইভাবে খেলা দেখাতে দেখাতে, গোলমাল এবং কেউ কেউ আমাকে বিরক্ত করার ফলে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, প্রায় আধমরা। যারা আমার কসরৎ দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তারা আমার বিষয়ে এমন বাড়িয়ে বলতে লাগল যে পরবর্তী দল দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চায়। আমাকে যাতে কেউ স্পর্শ করতে না পারে বা কেউ ক্ষতি করতে না পারে এজন্যে কর্তা নিজ স্বার্থে টেবিলের চারদিকে বেঞ্চি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন এবং একমাত্র আমার নার্স ছাড়া আমাকে যাতে কেউ স্পর্শ করতে না পারে সেজন্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। তবুও স্কুলের একটা দুষ্টু ছাত্র আমার মাথা লক্ষ্য করে একটা হেজেলনাট ছুঁড়ে মারল। ভাগ্যিস অল্প একটুর জন্যে সেটা ফসকে গিয়েছিল নইলে আমার মাথা

ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়ত। নাটটা কুমড়োর সমান বড়। যাহোক দুষ্টু ছেলেটাকে ধরে প্রহার দিয়ে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হল।

আমার কর্তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে আমাকে আবার দেখা যাবে পরের হাটবারের দিন। বাড়ি থেকে শহরে যাবার সময় আমার খুব কষ্ট হয়েছিল, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তারপর আটঘণ্টা খেলা দেখিয়ে আমি এত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিলাম না। গলা দিয়ে স্বরও বেরোচ্ছিল না। ইতোমধ্যে নিজ স্বার্থের জন্যেই এবং হয়তো আমাকে কিছু আরাম দেবার উদ্দেশ্যে কর্তা একটা গাড়ি তৈরি করালেন। সুস্থ হয়ে উঠতে আমার তিন দিন লাগল, তবুও কি নিস্তার আছে, বিশ্রাম পাবার উপায় নেই। আমার কথা শুনে একশ মাইলের মধ্য থেকে বহু লোক আমাকে দেখবার জন্যে দলে দলে আসতে লাগল। এ অঞ্চলে অনেক লোকের বাস, বউ বাচ্চা নিয়ে তারা আসতে লাগল। কর্তাও তাদের কাছ থেকে মোটা দর্শনী আদায় করতে লাগলেন। মাত্র একটা পরিবার এলেও তাদের কাছ থেকে তিরিশ জনের দেয় দর্শনী আদায় করছিলেন। বুধবার ওদের স্যাবাথ ডে তাই সেদিন ছাড়া আমাকে রোজই খানিকটা সময় দর্শকদের সামনে হাজির করা হত। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তবে ইতোমধ্যে আমাকে হাটবারে শহরে নিয়ে যাওয়া হয় নি।

আমার কর্তা যখন বুঝতে পারলেন যে আমাকে হাটে বাজারে দেখালে বেশ দুপয়সা উপার্জন হচ্ছে তখন তিনি স্থির করলেন যে রাজ্যের বড় বড় শহরে আমাকে নিয়ে যাবেন। অতএব দীর্ঘ ভ্রমণের জন্যে তিনি প্রস্তুত হলেন, বাড়ি ও চাষবাস দেখাশোনার ব্যবস্থা করলেন এবং স্ত্রীকে সব বুঝিয়ে তাকে সাবধানে থাকেতে বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি এই দেশে আসবার দুমাস পরে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট আমরা যাত্রা করলাম। যে বড় শহরে যাচ্ছি সেটা রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, বাড়ি থেকে প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে। কর্তা গ্লামডালক্লিচকেও সঙ্গে নিলেন, সে থাকবে পিছনে। আমি তো আছি বাক্সের মধ্যে গ্লাম বাক্সটা কোলের উপর তুলে নিয়ে কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে নিল। আমার যাতে কষ্ট না হয় সেজন্যে গ্লাম বাক্সটার ভিতরে সব দিকে নরম কাপড় বসিয়ে দিয়েছিল। আর তার পুতুলের বিছানা থেকে অনেকগুলো তোষক এনে মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে চাদর পেতে দিয়েছিল। আমি যাতে আরামে থাকতে পারি সেজন্যে সে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। কর্তা ও গ্লাম ছাড়া আমাদের সঙ্গে ছিল বাড়ির একটি বালক যে মালপত্র নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চলল।

আমার কর্তার মতলব ছিল পথে যত শহর সেখানে আমাকে দেখানো হবে এবং আমাদের রাস্তা থেকে পঞ্চাশ বা একশ মাইলের যত গ্রাম বা যদি কোনো ধনী ব্যক্তি থাকে তবে সেখানেও আমাকে দেখানো হবে, মূল লক্ষ্য অর্থ উপার্জন। আমরা প্রতিদিন সহজেই একশ দেড়শ মাইল অতিক্রম করতাম, তারও বেশি হয়তো পারা যেত কিন্তু যদি আমার কষ্ট হয় সেজন্যে গ্লাম তার বাবাকে বলত ঘোড়ায় চেপে একটানা যেতে তার কষ্ট হয়। মুক্ত বাতাস উপভোগ ও আশপাশ দেখার জন্যে গ্লাম আমাকে মাঝে মাঝে বাক্সের বাইরে এনে ছেড়ে দিতে কিন্তু আমার কোমরে একটি দড়ি বাঁধা থাকত, দড়িটি সে ছাড়াত না। ভ্রমণ পথে আমরা পাঁচ ছটা নদী পার হলাম, নদীগুলো মিশরের নীলনদ বা ভারতের গঙ্গা নদী অপেক্ষা অনেক বেশি চওড়া ও গভীর। লন্ডন ব্রিজের নিচে টেমস

নদী যেমন ঠিক তেমন বা তত ছোটো কোনো নদী আমার চোখে পড়ে নি। বড় নগরে পৌঁছবার আগে দশ সপ্তাহ কেটে গেল, ইতোমধ্যে আমাকে আঠারটি বড় শহরে, অনেক বড় গ্রামে এবং কিছু ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে দেখানো হল। অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখে আমরা সেই বড় নগরে পৌঁছলাম যার নাম লোরব্রুলগ্রুড বা দুনিয়ার গৌরব। নগরের প্রধান রাস্তার উপরে, প্রাসাদ থেকে অনুতিদূরে আমার কর্তা বাসা নিলেন। আমার চেহারা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে কর্তা যথারীতি প্রাচিরপত্র টাঙিয়ে দিলেন। তিনশ থেকে চারশ ফুট চওড়া একটা বড় ঘর কর্তা ভাড়া নিলেন। একটা গোল টেবিলও আনলেন, তার ব্যাস ষাট ফুট। এরই উপর আমাকে খেলা দেখাতে হবে এবং আমি যাতে টেবিল থেকে পড়ে না যাই সেজন্যে টেবিলটি ঘিরে তিন ফুট উঁচু বেড়া দেওয়া হল। আমাকে প্রতিদিন দশবার দেখানো হত, সকলে অবাক হত তবে সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরত। আমি তখন ওদের ভাষায় মোটামুটি কথা বলতে পারি তবে বুঝতে পারি সবই। গ্লাম আমাকে বাড়িতে শেখাত পড়াত। পথে আসতে আসতেও পড়িয়েছে যার ফলে ওদের ভাষার অক্ষর পরিচয় হয়েছে এবং লিখতেও পারি। তরুণীদের ব্যবহার যোগ্য একটা ছোটো ধর্মপুস্তক গ্লাম তার পকেটে রাখত, ছোটো হলেও বইখানা স্যানমন'স অ্যাটলাসের মতো বড় হবে। গ্লাম আমাকে সেই বইখানাও পড়িয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[লেখককে রাজসভায় ডেকে পাঠানো হল। চাষী কর্তার কাছ থেকে রানি তাকে কিনে নিলেন এবং রাজার সামনে তাকে হাজির করলেন। লেখক সম্রাটের পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। প্রাসাদে লেখকের থাকবার ঘর ঠিক করে দেওয়া হল। সে অচিরে রানির প্রিয়পাত্র হল। লেখক নিজদেশের সম্মান রক্ষায় তৎপর। রানির বামনের সঙ্গে তার বিবাদ।]

কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রচুর পরিশ্রমের ফলে আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকল। আমাকে দেখিয়ে কর্তার যত আয় হয় ততই তার লোভ বেড়ে যায়। এদিকে আমার ক্ষিধে কমতে থাকে, রোগা হয়ে যাই, হাড় বেরিয়ে পড়ে। কর্তাও আমার স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ করেছিল এবং ধরে নিয়েছিল আমি শীঘ্র মারা যাব তাই তিনি ভাবলেন ইতোমধ্যে যত পারেন তত টাকা তুলে নেবেন। তিনি যখন এইরকম ভাবছেন তখন স্ক্রারডাল অর্থাৎ ভদ্রদূতের আগমন হল। তিনি কর্তাকে আদেশ করলেন যে রানি ও তাঁর সখিবৃন্দের চিত্তবিনোদনের জন্যে আমাকে অবিলম্বে রাজসভায় হাজির করতে হবে। যারা আমাকে এর মধ্যে দেখেছিল তাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় রানির কাছে আমার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল। আমি কেমন, কী খাই, বা কথা বলি কিনা, ওদের ভাষা জানি কিনা, ইত্যাদির বিবরণ শুনেই হয়তো মহারানি আমাকে দেখবার জন্যে আগ্রহী হয়েছিলেন। আমাকে রানির সামনে হাজির করা হল। রানি ও তাঁর সহচরীরা আমার আচরণে মুগ্ধ। আমি রানির সামনে হাঁটুগেড়ে বসে তাঁর পদচুম্বন করতে চাইলাম। কিন্তু আমাকে টেবিলে তুলে দেওয়া হল। রানি তাঁর কড়ে আঙুল আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি আঙুলটি দুহাতে ধরলাম ও অগ্রভাগে আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করলাম। রানি আমাকে আমার দেশ ও

আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, আমি যথাযথ স্পষ্ট করে ও সংক্ষেপে তার উত্তর দিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি রাজপ্রাসাদে বাস করতে রাজি কি না। আমি কোমর বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে মহারানিকে বিনীতভাবে বললাম আমি আমার কর্তার দাস কিন্তু আমার যদি স্বেচ্ছায় কাজ করার অধিকার থাকত তাহলে আমি নিশ্চয় মহারানির সেবায় নিজেকে নিবেদন করে গৌরব বোধ করতাম। মহারানি তখন আমার কর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কর্তা আমাকে ভালো দামে বিক্রী করতে রাজি আছে কি না। কর্তা তো ভেবেছিলেন আমি বড়োজোর আর মাসখানেক বাঁচব অতএব আমাকে বেচে যা পাওয়া যায় তাই লাভ এবং আমার জন্যে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দাবি করল। এই অর্থ কর্তাকে অবিলম্বে দিয়ে দেওয়া হল। এক একটি স্বর্ণমুদ্রার আকার আটশত ময়ডোরের সমান। ইউরোপের তুলনায় এদেশের সব কিছুর আকার বিরাট তাই ইউরোপের চড়া সোনার দামের হিসেব করলে এখানকার এক একটি স্বর্ণমুদ্রার দাম ইংল্যান্ডে হাজার গিনিতে বিক্রয় হবে। এখন আমি মহারানির দাস। সাহস করে তাকে বললাম, গ্লামডালক্লিচ নামে এই মেয়েটি বরাবর আমাকে অত্যন্ত যত্ন ও করুণার সঙ্গে আমার দেখাশোনা করেছে এবং সে আমার আচার ব্যবহারের সঙ্গে সুপরিচিত। মহারানি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে গ্লামকে আমার নার্স ও শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। মহারানি আমার আবেদনে সাড়া দিলেন। আমার প্রাক্তন কর্তাও রাজি হল কারণ মেয়ে রাজ বাড়িতে থাকবে আর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। গ্লামও তার আনন্দ ঢাকতে পারল না, সেও খুব খুশি। আমার প্রাক্তন কর্তা এবার বিদায় নেবেন, আমাকে বললেন, তোমার ভালো ব্যবস্থাই করে গেলাম। আমি কিছু না বলে শুধু মাথা নিচু করে তাকে বিদায় জানালাম।

রানি আমার দুর্বল শরীর লক্ষ করলেন এবং চাষী কর্তা চলে যাবার পর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। চাষী এখন আর আমার কর্তা নয়, আমি তার কাছে কোনো কাজ বা কথার জন্যে দায়ী নই তাই আমি রানিকে বললাম কী ভাবে সেই চাষী আমাকে তার ক্ষেতে হঠাৎ কুড়িয়ে পায় এবং আমার জন্যে সে যা করেছে তার প্রতিদানে আমাকে রাজ্যের প্রায় অর্ধেক দেশে দেখিয়ে ও বিক্রী করে অনেক গুণ বেশি লাভ করেছে। এজন্যে আমাকে এত বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে যে আমার চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী একটা প্রাণী মারা যেতে পারত। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কসরৎ দেখাতে দেখাতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আর কিছুদিন পরে হয় আমি অথর্ব হয়ে পড়তাম বা মারা যেতাম তা নইলে আমার চাষী কর্তা আপনার কাছে আরো অনেক বেশি দাম দাবি করত, এত সস্তায় ছাড়ত না। কিন্তু তখন মহারানির আশ্রয়ে আমার আর নিষ্ঠুর ব্যবহারের ভয় নেই। মহারানি সর্বগুণসম্পন্না, দয়াবতী, প্রজাদের হিতকারী, তুলনাহীনা। অতএব আমি মনে করি আমার মৃত্যুভয় আর থাকবে না বলতে কি মহারানির কোমল ব্যবহার ও কথাবার্তা আমার মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করেছে।

আমি ছোটাখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম, কিছু দ্বিধা কিছু ত্রুটি হয়তো ছিল। আমাকে যখন রাজপ্রাসাদে আনা হচ্ছিল তখন কী করে কথা বলতে হবে কী রকম আচরণ করতে হবে এসব গ্লামডালক্লিচ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। যে দেশের যে রীতি তা তো মানতে হবে।

আমার বাচনভঙ্গিতে যে ত্রুটি ছিল মহারানি সে সব গ্রাহ্য করলেন না, এমন ক্ষুদে মনুষ্যাকৃতি একটা জীব পরদেশের ভাষায় এমন চমৎকার সব কথা বলছে তাই শুনে তিনি চমৎকৃত। তিনি আমাকে তার নিজের হাতে তুলে নিলেন তারপর আমাকে নিয়ে চললেন মহারাজের ঘরে। মহারাজা তখন তাঁর খাস কামরায় বিশ্রাম করছিলেন। মহারাজাকে দেখতে মহারাজার মতোই। বেশ একটা রাজকীয় গাম্ভীর্য আছে এবং সারা মুখটায় বিশেষ একটা সৌন্দর্য আছে। রানির হাতে ক্ষুদে কী একটা পড়ে আছে সেজন্যে তিনি সেদিকে তেমন মন দেন নি। তাছাড়া আমি মহারানির হাতে উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম তাই তিনি বললেন, তুমি আবার কবে থেকে এসপ্লাকনাক পুষতে আরম্ভ করলে? মহারানি মুচকি হাসলেন অর্থাৎ মহারাজাকে বলতে চাইলেন তোমাকে অবাক করে দিচ্ছি। তারপর আমাকে তুলে মহারাজার সামনে ছোটো একটা গোলাকার টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে মহারাজাকে আমার পরিচয় দিতে বললেন। আমি অল্প কথায় আমার পরিচয় পেশ করলাম। গ্লামডালক্লিচ খাসকামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে তার চোখের আড়াল করতে চায় না। তাকে ভিতরে আসতে দেওয়া হল এবং আমি যা বলেছিলাম তার সমর্থনে তার বাবা আমাকে ক্ষেতে কুড়িয়ে পাওয়ার পর থেকে যা কিছু ঘটেছিল সব বলল।

মহারাজা তাঁর রাজ্যের যে কোনো সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা কম শিক্ষিত নন। তিনি দর্শন পড়েছেন এবং গণিতে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু যখন আমি আমার দুপায়ে সোজা হয়ে চলতে আরম্ভ করলাম তখন ভেবেছিলেন আমি বুঝি দমদেওয়া একটা ঘড়ি (সে দেশে তখন সবেমাত্র ভালো ঘড়ি তৈরি হচ্ছে), কোনো কুশলী কারিগর তৈরি করেছে। কিন্তু যখন তিনি আমার ভাষণ শুনলেন তখন তিনি রীতিমতো অবাক। তিনি বুঝলেন আমি কোনো একটা ভাষায় কথা বলছি যদিও সে ভাষা তাঁর অজানা। আমি তাঁর দেশে কী ভাবে এলাম তা তাঁকে বললাম কিন্তু তিনি বোধহয় বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বোধহয় ভাবলেন যে আমাকে চড়া দামে বিক্রি করবার জন্যে গ্লামডালক্লিচ ও তার বাবা একটা কাল্পনিক কাহিনী খাড়া করে এবং সেই কাহিনীটি ওরা ওদের ভাষায় বলতে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। এই ভেবে তিনি আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ উত্তরই পেতে থাকলেন। অবশ্য এদেশের ভাষা আমি তখনো উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে পারি নি, আমার উচ্চারণে ত্রুটি ছিল যা রাজসভায় উচ্চারণ করার অনুপযুক্ত।

আমি জীবটা কেমন সেটা স্থির করবার জন্যে মহারাজা তাঁর তিনজন মহামান্য পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে আমাকে দূর থেকে, কাছ থেকে, উল্টে পাল্টে নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন যে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আমার জন্ম হয় নি। আমি যে পৃথিবীতে কী করে বেঁচে আছি তাও তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কারণ আমি দ্রুতগামী নই, গাছে উঠতে পারি না, গর্ত খুড়তে পারি না। তাঁরা আমার দাঁতগুলো উত্তমরূপে পরীক্ষা করলেন এবং সাব্যস্ত করলেন যে আমি সর্বভূক। কিন্তু অধিকাংশ চতুষ্পদ প্রাণী বা ছোটোখাটো জীব যথা ইঁদুর যেভাবে জীবন ধারণ করে আমার সে ক্ষমতাও নেই এবং আমি যদি শামুক বা কিছু পোকা-মাকড় না খাই তাহলে আমি বেঁচে থাকব কী করে? তাঁরা এজন্যে নানারকম যুক্তি ও তথ্য পেশ করলেন। একজন পণ্ডিত

বললেন আমি এখনো ভ্রূণ অবস্থায় আছি, অস্বাভাবিকভাবে আমার জন্ম হয়ে গেছে, ঠিক সময়ে আমার জন্ম হলে আমি ওঁদের মতোই দীর্ঘাকৃতি হতাম। কিন্তু অপর দুই পণ্ডিত তাঁর এই যুক্তি বাতিল করে দিলেন। তাঁরা বললেন আমার হাত পা, অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক এবং আমার বেশ বয়সও হয়েছে, এই পৃথিবীতে বেশ কিছু দিন বেঁচে আছি। তাঁরা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আমার কাটা দাড়ি পরীক্ষা করে এই রায় দিলেন। তাঁরা বললেন আমি বামন নই কারণ বামনরাও এত খাটো হতে পারে না। রানির যে প্রিয় বামনটি আছে, যে নাকি এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা ছোটো আর উচ্চতা তিরিশ ফুট। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সাব্যস্ত করলেন আমি প্রকৃতির খেয়াল।

তাঁরা এইরূপ সাব্যস্ত করার পর আমি প্রার্থনা করলাম আমাকে কয়েকটা কথা বলতে দেওয়া হোক। অনুমতি পেয়ে মহারাজাকে বললাম আমি যে দেশ থেকে এসেছি সে দেশে আমার মাপ অনুযায়ী লাখ লাখ নরনারী আছে এবং সেদেশের বাড়ি ঘর জীবজন্তু গাছপালা সেই মাপ অনুযায়ী ঠিক। আপনাদের দেশে আপনারা যেমন দীর্ঘকায় তেমনি আপনাদের গাছপালা ও জীবজন্তুও বিরাটকায়। মহারাজা আপনার রাজ্যে যেমন প্রজাদের অনেক অধিকার আছে আমাদের দেশেও অনুরূপ অধিকার আমরাও ভোগ করি। আপনার পণ্ডিতগণ যা সাব্যস্ত করলেন তা ঠিক নয়। পণ্ডিতেরা অবশ্য আমার কথা মানলেন না, বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। তাঁরা মন্তব্য করলেন আমার সেই কর্তা চাষী আমাকে ভালোভাবেই শিখিয়ে দিয়েছে! মহারাজার মন কিন্তু তার পণ্ডিতগণ অপেক্ষা যুক্তিবাদী, তাঁর বোধশক্তি প্রখর। তিনি পণ্ডিতদের বিদায় দিয়ে সেই চাষীকে ডেকে পাঠালেন। সৌভাগ্যক্রমে চাষী তখনো নগর ছেড়ে চলে যায় নি। মহারাজা তাকে নিজে পৃথক ভাবে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, পরে তার কন্যা ও আমাকে ডাকলেন। সকলকে নানা প্রশ্ন করে তাঁর সম্ভবত বিশ্বাস হল আমি সত্য কথাই বলছি। তিনি মহারানিকে আদেশ দিলেন যে আমার জন্যে যেন বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। আমার দেখাশোনার জনে গ্লামডালক্লিচ থাকবে কারণ মহারাজা আমাদের দুজনের মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক লক্ষ করেছিলেন। গ্লামের জন্যে রাজপ্রাসাদের মধ্যে পৃথক কক্ষ ঠিক করে দেওয়া হল, তার শিক্ষার জন্যে একজন গভরনেস নিযুক্ত করা হল, তাকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরানো ও তার প্রসাধনের জন্যে আরো একজন মহিলাকে নিযুক্ত করা হল। এছাড়া ছোটোখাটো কাজের জন্যে দুজন পরিচারিকাও নিযুক্ত করা হল। কিন্তু আমার সব কাজ গ্লাক করবে। রানি তাঁর আসবাব প্রস্তুতকারককে আদেশ দিলেন আমার বাসযোগ্য একটি বাক্স তৈরি করে দিতে কিন্তু তার মধ্যে শয়ন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অংশ কীভাবে নির্মিত হবে তা আমি ও গ্লাম ঠিক করে দেব। আসবাব প্রস্তুতকারক একজন কুশলী কারিগর। সে বার ফুট উচ্চ ও ষোল ফুট চৌকো চমৎকার একটি কাঠের চেম্বার বানিয়ে দিল। শার্সি সমেত জানালা এবং দরজা তো রইলই এবং ওরই মধ্যে লন্ডন বেডচেম্বারের মতো দুটো কুঠুরিও বানিয়ে দিল। ছাদের সঙ্গে যুক্ত করে কব্জা লাগিয়ে এমন কৌশলে শোবার খাট তৈরি করে দিল যে সেটি ওঠানো নামানো যাবে। রাজবাড়ির বিছানা সরবরাহকারী উত্তম বিছানা তৈরি করে দিল। খাটসমেত বিছানা গ্লাম সহজেই রোদে দিতে পারত আবার দরকারের সময় নামিয়ে দিত। কাঠের মিস্ত্রী আমার জন্যে দুটি সুন্দর চেয়ার তৈরি করে দিল, ঠেস দেবার জায়গায় হাতির দাঁতের মতো চমৎকার একটা সাদা পদার্থ সেঁটে দিল।

দুটো টেবিল তৈরি করে দিল আর আমার জিনিসপত্র রাখবার জন্যে একটা দরজাওয়ালা অনুচ্চ আলমারিও বানিয়ে দিল। কাঠের ঘরের দেওয়াল ও মেঝেতে তুলোর তোশক বসিয়ে দেওয়া হল। যারা আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, দুর্ঘটনাক্রমে তাদের হাত থেকে আমি পড়ে গেলেও আমার দেহে যেন আঘাত না লাগে। আমাকে আরাম দেবার সব রকম ব্যবস্থাই করা হল। দরজায় তালার ব্যবস্থা করে দিতে বললাম কারণ এ দেশের ইঁদুরকে আমার বড় ভয়। একজন স্যাকরা অতি ছোটো একটি তালা বানিয়ে দিল। ওদের তুলনায় খুবই ছোটো। অবশ্য এর চেয়ে বড় তালা আমি ইংল্যান্ডে একজন ভদ্রলোকের বাড়ির ফটকে দেখেছিলাম। তালার চাবি রাখবার জন্যে পকেটের মধ্যে ছোটো একটা পকেট করলাম। চাবি নিজের কাছেই রাখতাম কারণ ভয় ছিল গ্লাম যদি চাবি হারিয়ে ফেলে, এই চাবি ওর কাছে খুবই ছোটো। দেশে সবচেয়ে যে পাতলা সিল্ক আমাদের ইংলিশ কম্বলের চেয়ে অল্প পাতলা। এত মোটা কাপড়ের পোশাক পরতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল তবে ক্রমশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পোশাক ওদের ফ্যাশান অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল যার খানিকটা পারসিক পোশাকের মতো, আর খানিক চৈনিক পোশাকের মতো। তাহলেও পোশাকের ইজ্জত আছে।

মহারানির কাছে আমি শেষ পর্যন্ত এমন প্রিয় হয়ে উঠলাম যে রানি আমাকে ছাড়া আহারে বসতে পারতেন না। তাঁর খাবারের টেবিলের উপরে বাঁ দিকে আমার জন্যে এবং আমার মাপ মতো একটি টেবিলও চেয়ার বসানো হল। গ্লামডালক্লিচ পাশেই একটি টুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকত আমাকে সাহায্য করবার জন্যে। রানি আমার জন্যে এক সেট ডিশ প্লেট ছুরি কাঁটা চামচ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। লন্ডনে একটি খেলনার দোকানে আমি এক সেট খেলাঘরের ডিনারসেট দেখেছিলাম। সেগুলো আমার কাছে যেমন ছোটো মনে হয়েছিল আমার ডিনারসেট নিশ্চয় এদের কাছে তেমনি ছোটো মনে হচ্ছে। রুপোর এই বাসনগুলো আমার ছোটো নার্স গ্লাম সযত্নে পরিষ্কার করে একটি রুপোর কৌটায় ভরে তার পকেটে রেখে দিত এবং দরকারের সময় বার করে নিত। রানির সঙ্গে দুজন রাজকুমারী ছাড়া আর কেউ ভোজন করত না। রানির বড় কন্যাটির বয়স ষোল আর ছোটোটির তের বছর এক মাস। রানি এক টুকরো মাংস আমার টেবিলে তুলে দিতেন, আমি আমার আবশ্যক মতো টুকরা কেটে নিতাম। আমি আবার সেই টুকরো থেকে ছোটো ছোটো টুকরো আমার কাঁটায় গেঁথে মুখে পুরতাম তাই দেখে রানি খুব কৌতুক অনুভব করতেন। কারণ রানি নিজে যে (তাঁর হজমশক্তি দুর্বল ছিল) মাংসের বড় টুকরোটি মুখে পুরতেন সেটি এত বড় ছিল যে 'বারজন ইংরেজ চাষী' সেই এক টুকরো মাংস পেলে তাদের একবারের খাওয়া হয়ে যেত। একজন মহিলা (অবশ্য আকারে বৃহৎ) অত বড় এক টুকরো মাংস মুখে পুরছেন দেখেই আমার গা গুলিয়ে উঠত। একটা সারস পাখির অর্ধেক অংশ তিনি মুখে পুরে দিতেন তারপর হাড়গোড় সব কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেতেন। সেই সারস পাখি আমাদের ন'টা টার্কির সমান হবে আর তিনি মাংস খেতে খেতে যে রুটির টুকরো মুখে দিতেন তা আমাদের বার পেনি দামের দুটো রুটির সমান। পিপে থেকে সোনার কাপে সুরা ঢেলে তিন ঢক করে খেয়ে ফেলতেন। তার ছুরি ও চামচ ও অন্যান্য সরঞ্জাম তাঁর হাতের মাপ মতোই ছিল। আমাকে গ্লাম একবার আমার কৌতূহল মেটাতে ডাইনিং হলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে

টেবিলের উপর বিরাট আকারের ছুরি কাঁটা দেখে আমি অবাক। বাবাঃ, এত বিরাট আকারের ছুরিকাঁটা আমি কখনো দেখি নি, ভাবতেই পারি না।

প্রতি বুধবার (আগে বলেছি বুধবার ওদের স্যাবাথ ডে—বিশ্বাস দিবস) রাজা; রানি, রাজকুমার ও রাজকুমারীরা মহারাজার কক্ষে একত্রে ডিনার খেতেন। তাঁদের টেবিলের উপর আমারও টেবিল পড়ত, আমিও তাঁদের সঙ্গে আহার করতাম। কারণ মহারাজাও আমাকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন। ওঁদের টেবিলের বাঁ দিকে আমার টেবিল পড়ত, পাশেই থাকত লবণদানী। রাজকুমার আমার সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসতেন। তিনি ইউরোপের রীতিনীতি, ধর্ম, আইন, শাসনকার্য, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে চাইতেন। আমি যথাসম্ভব তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতাম। তাঁর বোধশক্তি ও বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। আমার বক্তব্য শোনার পর তিনি বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করতেন। তবে আমি এ কথা বলব যে আমার প্রিয় স্বদেশভূমির বিষয় যথা তার ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থলে জলে যুদ্ধ, ধর্ম নিয়ে বিভেদ, দেশের রাজনৈতিক দল, শিক্ষা নিয়ে গোঁড়ামি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম। রাজকুমার তখন আমাকে তাঁর হাতে তুলে নিয়ে অপর হাত দিয়ে আমার পিঠে মৃদুভাবে হাত বোলাতে বোলাতে খুব হাসতেন। হাসতে হাসতে আমাকে প্রশ্ন করতেন, মশাই তুমি কোন দলের? হুইগ না টোরি? রাজদণ্ডের সমান দীর্ঘ একটি সাদা যষ্টি নিয়ে তাঁর প্রথম মন্ত্রী তাঁর পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে কুমার বললেন মানুষের এই সব জাঁকজমক ও আড়ম্বর তুচ্ছ মনে হয় যখন ভাবি আমার হাতের উপরের এই ক্ষুদে মানুষরাও নাগরিকদের উপাধি ও সম্মান প্রদান করে, বাড়ি ঘর শহর তৈরি করে, সাজপোশাক তৈরি করে, ভাব ভালোবাসা করে, আবার যুদ্ধও করে, অপর মানুষকে ঠকায়, বিশ্বাসঘাতকতাও করে। আমাদের মহান দেশ সম্বন্ধে কুমারের ভালো মন্তব্য শোনবার সময় যেমন গৌরব বোধ করছিলাম তেমনি কটু মন্তব্য শোনবার সময় ক্রোধও হচ্ছিল, মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের শিল্প বা সমর-সজ্জা, ফ্রান্সের কিছু কলঙ্ক, ইউরোপের স্বাধীন নারী, আমাদের নৈতিক উৎকর্ষ বা ধর্মাচরণ, সম্মান বা সত্যবাদীতা কিংবা অহংকার ও হিংসা সম্বন্ধে তাঁর অনেক মন্তব্য আমার ভালো লাগে নি।

কিন্তু মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হয়, আমার এমন ক্ষমতা নেই যে ওদের সঙ্গে পেরে উঠি। মনকে বোঝাই, নিজের দেশেও তো অনেক কিছু দেখে বিদ্রূপ করি বা হাসি বা বাহবা দিই, অতএব এ ধরনের দোষ গুণ এদেরও থাকবে। মাঝে মাঝে আমিও মনে মনে হাসি। রানি যখন আমাকে তাঁর হাতে তুলে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ান তখন আমার নিজেকেই নিজের আসল আকার অপেক্ষা খুব ছোটো মনে হয়। তখন আমার হাসি পায়।

কিন্তু আমার ক্রোদ হয় এবং আমি মর্মাহত হই যখন রানির সেই দুর্বিনীত বামন আমাকে বিদ্রূপ করে । ওদের দেশে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা তার উচ্চতা অনেক কম (ওর উচ্চতা তিরিশ ফুটের বেশি নয়)। তবুও সে আমার চেয়ে অনেক লম্বা, তারই সুযোগ নিয়ে সে মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে আমাকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করে। অপমানে আমার গা জ্বালা করে। আমি যখন রানির খাস কামরায় রাজসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলি সেই সময়ে সে ইচ্ছে করে আমার পাশ দিয়ে কয়েকবার যাবে ও সেই সঙ্গে আমার

ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করবে। আমি কী আর করব, তখন তাকে 'এসো আমার ভাই' বলে শুধু সম্বোধন করতাম। বা ঠাট্টএর কিছু বলতাম। আমার কোনো মন্তব্য তাকে খোঁচা দিয়ে থাকবে তাই একদিন আমি যখন মহারানির ডাইনিং টেবিলে আহার করছিলাম সেই সময়ে বামনটা একটা চেয়ারে উঠে আমাকে আমার কোমর ধরে ক্রীম ভর্তি বড় একটা রুপোর বাটিতে ফেলে দিয়েই পালাল। আমি সাঁতার না জানলে ডুবেই যেতাম। গ্লামডালক্লিচ তখন আমার পাশে না থাকলেও ঘরে অপর প্রান্তে ছিল, আর রানি যদিও সামনেই ছিল কিন্তু এমন ভয় পেয়েছিল যে কী করবেন বুঝতেই পারছিলেন না। আমার ছোট্ট নার্স আমাকে রক্ষা করার জন্যে ছুটে এসে ক্রিমের বাটি থেকে তুলে নিল। ততক্ষণে আমি বেশ খানিকটা ক্রিম গিলে ফেলেছি। তবে আমার কোনো ক্ষতি হয় নি, পোশাকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গ্লাম আমাকে শুইয়ে দিল। বামনটাকে শাস্তি দেওয়া হল, তাকে বেশ করে চাবুকপেটা করা হল এবং সেই বাটি ভর্তি সব ক্রিমটা তাকে খেতে হল। রানি তাকে আর কাছে আসতে দিলেন না। শুধু তাই নয়, তাকে প্রাসাদ থেকে বিদায় করে এক অভিজাত মহিলাকে দান করে দিলেন। আমি বাঁচলাম। হিংসুটে বেঁটে বামনটা রেগে গিয়ে আমার আরো সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি করতে পারত।

এর আগেও বেঁটেটা আমার সঙ্গে বিশ্রী রকম রসিকতা করেছে। তা দেখে রানি হেসেছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে অস্বস্তি বোধও করেছেন এবং বেঁটেটাকে হয়তো কঠোর শাস্তি দিতেন যদি না আমি বাধা দিতাম। মহারানি মজ্জাভর্তি একটা ফাঁপা হাড় তুলে নিলেন তারপর তার ভিতর থেকে মজ্জা ঠুকে ঠুকে বার করে নিয়ে ও পরে হাড়টা চুষে খেয়ে নিয়ে হাড়টা প্লেটের উপর দাঁড় করিয়ে রাখলেন। বেঁটের মাথায় সর্বদা দুষ্ট বুদ্ধি। গ্লাম যে টুলটায় দাঁড়িয়ে আমার খাওয়ার তদারক করে সে নিজের চেয়ার ছেড়ে চট করে সেই টুলটায় উঠে দাঁড়িয়ে টপ করে আমাকে তুলে নিল তারপর আমার পা দুটো টিপে ধরে সেই ফাঁপা হাড়ের মধ্যে কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল। আমি সেই অবস্থায় অসহায় হয়ে আটকে রইলাম। আমি সেই অবস্থায় প্রায় এক মিনিট আটকে ছিলাম, কেউ লক্ষ করে নি এবং আমিও চেঁচাই নি। এরা গরম মাংস খান না তাই আমার পা পোড়ে নি কিন্তু আমার মোজা ও ব্রিচেস নষ্ট হয়ে গেল। বেঁটে কয়েক ঘা বেত খেয়ে ছাড়া পেল, আমি অনুরোধ না করলে রীতিমতো উত্তম-মাধ্যম খেতে হত।

আমার সাহসিকতার জন্যে রানি আমাকে মাঝে মাঝে চুটকি মন্তব্য করতেন এবং হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কী গো তোমাদের দেশের সব লোক তোমার মতো ভীতু নাকি?' একটা ঘটনা এইরকম ঘটেছিল। এ রাজ্যে গ্রীষ্মকালে মাছির বড় উৎপাত। এক একটা মাছি ডানস্টেবল সারস পাখির সমান বড়, আমি যখন খেতে বসতাম এই বিশ্রী পোকাগুলো আমাকে বিরক্ত করে মারত, কানের কাছে সর্বদা ভোঁ ভোঁ করত। মাঝে মাঝে পোকাগুলো আমার খাবারের উপর বসে মলত্যাগ করত বা ডিম পাড়ত। এসব অবশ্য এদশের মানুষের নজরে আসত না, চোখ বড় হলে কী হয় এত ছোটো জিনিস ওদের চোখে ধরা পড়ে না। কখনো কখনো মাছিগুলো আমার নাকে বা কপালে বসে দংশন করত আর আমি বেশ বুঝতে পারতাম কী একটা চটচটে পদার্থ আমার দেহে লাগল। সেটার বিশ্রী গন্ধ। আমাদের দেশের প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বলেন যে ঐ চটচটে পদার্থর জন্যে ওরা ঘরের ভিতরের ছাদে পা উঁচু করে হাঁটতে পারে। বিশ্রী মাছিগুলোর

হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমাকে রীতিমতো হাত পা ছুঁড়তে হত। খুব খারাপ লাগত যখন মাছিগুলো মুখে বসত। বেঁটে বামনটা স্কুলের ছেলের মতো প্রায়ই পাঁচ সাতটা মাছি ধরে, রানিকে মজা দেখাবার জন্যে আমার নাকের তলায় ছেড়ে দিত। আমি আমার ছোরা বার করে ওগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে দুটুকরো করে দিতাম। টেবিলে যারা থাকত তারা আমার কৌশলের প্রশংসা করত।

একদিন সকালের কথা মনে পড়ে। আমি যাতে মুক্ত বায়ু সেবন করতে পারি এজন্যে গ্লামডালক্লিচ আমার ঘর-বাক্সটা জানালার ধারে রেখে গেছে। ইংল্যান্ডে আমরা যেমন জানালার বাইরে পাখির খাঁচা টাঙিয়ে দিই সেরকম আর কি। তবে এভাবে আমার ঘর-বাসা টাঙানো সাহস হয় না। আমি একটা একটা শার্সি তুলে দিয়েছি।। পরিষ্কার দিন। টেবিলের উপর কেক রাখা হয়েছে, চেয়ারে বসে একটু একটু করে কেক খেতে খেতে ব্রেকফাস্ট করছি, এমন সময় বোধহয় মিষ্টি কেকের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গোটা কুড়ি বোলতা খোলা জানালা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঘরের ভিতর বোলতাগুলো উড়তে উড়তে বোঁ বোঁ আওয়াজ করছে যেন ব্যাগপাইপ বাজছে। কয়েকটা বোলতা তো কেকের উপর বসে খানিকটা করে কেক তুলে নিয়ে গেল। কতকগুলো তো আমার মাথার উপর বা মুখের কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, হুল ফুটিয়ে দিলেই হয়েছে আর কি! যাহোক আমি সাহস করে আমার ছোরা বার করে ওগুলোকে আক্রমণ করলাম। চারটে বোলতাকে মাটিতে পেড়ে ফেললাম, বাকিগুলো জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ করে দিলাম। এক একটা বোলতা আকারে তিতির পাখির সমান। ওদের হুল দেখলাম, এক একটা দেড় ইঞ্চি লম্বা আর সুচের মতো ধারালো। মরা বোলতাগুলো আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। বোলতাগুলো এবং আরো কিছু জিনিস আমি ইউরোপে অনেককে দেখিয়েছিলাম। ইংল্যান্ডে ফিরে আমি তিনটে বোলতা গ্রেশাম কলেজে দান করেছিলাম আর একটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[দেশটির বর্ণনা। আধুনিক মানচিত্র সংস্কারের প্রস্তাব। রাজপ্রাসাদ ও নগরের বর্ণনা। লেখকের ভ্রমণের বিশেষত্ব। প্রধান মন্দিরের বিবরণী।]

আমি এবার পাঠকদের এই দেশটির সংক্ষেপে কিছু বিবরণ দেব। তবে পুরো দেশটা নয়। প্রধান নগর লোরব্রুলগ্রুড-এর চারদিকে দুহাজার মাইল পর্যন্ত আমি ঘুরেছি, সেইটুকুর বিষয়ই জানাব। কারণ মহারানি আমাকে নিয়ে মহারাজার সঙ্গেই বেরোতেন। মহারানিকে এক জায়গায় রেখে মহারাজা দেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতেন। মহারাজার অধিকারে এই দেশটি দৈর্ঘ্যে ছহাজার মাইল ও প্রস্থে তিন থেকে পাঁচ হাজার মাইল হবে। কী ভাবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম বলতে পারব না, আমার বিশ্বাস যে ইউরোপের ভৌগোলিকরা একটা মস্ত ভুল করেছেন, তাঁরা বলেন ক্যালিফরনিয়া ও জাপানের মধ্যে সমুদ্র ব্যতীত কোনো দেশ নেই। কিন্তু আমার চিরদিনই বিশ্বাস যে

পৃথিবী তার ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যে টারটারি মহাদেশের বিপরীতে নিশ্চয় আর একটা দেশ রয়েছে। তাই অ্যামেরিকার উত্তর পশ্চিম দিকে যে বিশাল দেশটি রয়েছে সেটি তাদের ম্যাপ ও চার্টে দেখিয়ে ভ্রম সংশোধন করুক এবং এই বিষয়ে আমি তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এই রাজ্যটি একটি উপদ্বীপ যার উত্তর-পূর্ব দিকে আছে তিরিশ মাইল উচ্চ এক পর্বতশ্রেণী যা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, কারণ পর্বত চূড়ায় বিশাল আগ্নেয়গিরি আছে। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিতরাও জানেন না পর্বতের ওধারে মানুষ বা কী ধরনের জীব বাস করে অথবা কোনো জীব হয়তো ওধারে বাস করেই না। এই রাজ্যের তিন দিকে সমুদ্র। সারা সমুদ্র উপকূলে কোথাও একটাও বন্দর নেই। তাছাড়া নদীগুলো যেখানে সমুদ্রে পড়েছে সেখানে বিরাট সব সুচালো পাথর আছে আর সেই পাথরের উপর ক্ষিপ্ত সমুদ্র আছড়ে পড়ছে। এজন্যে ওখানে ছোটো নৌকো ভাসাতেও কেউ সাহস করে না।

এই কারণে এই দেশের মানুষ দেশ থেকে বেরোতে পারে নি এবং অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে নি। এরা একাই বসবাস করছে। দেশের বড় বড় নদীগুলাতে বড় বড় জলযান আছে আর আছে বড় বড় সুস্বাদু মাছ। ওরা এই মাছ খায়। সমুদ্রেও মাছ আছে, সে মাছের আকারের ইউরোপের সমুদ্রের মাছের মতো। একে তো এরা সমুদ্রে যেতে পারে না এবং যেহেতু সমুদ্রের মাছের আকার এদের তুলনায় ক্ষুদ্র অতএব ওরা সমুদ্রে মাছ ধরার ঝুঁকি নেয় না। এদেশে গাছপালা ও পশুপাখি প্রচুর এবং তাদের আকারও বিরাট। কেন এমন হয়েছে তা দার্শনিকরা স্থির করবেন। মাঝে মধে তিমি মাছ সমুদ্র উপকূলের সুচালো পাথরে আছাড় খেয়ে পড়লে এরা তিমিটাকে তুলে আনে, রান্না করে তৃপ্তি করে খায়। এই তিমি এত বড় যে একজন মানুষ তার কাঁধে ফেলে বয়ে আনতে পারে না তবে টুকরি করে লোব্রুলগ্রুডে বয়ে আনে। একটা মাছ আমি রাজার ডাইনিং টেবিলে একটা ডিশে দেখেছিলাম। এ মাছ দুর্লভ তবে রাজা এ মাছ পছন্দ করলেন না, হয়তো এর বিরাট আকারের জন্যে। আমি অবশ্য গ্রীনল্যান্ডে এর চেয়েও বড় তিমি দেখেছি।

এদেশের জনসংখ্যা মন্দ নয়। একান্নটি নগর আছে, দেওয়াল ঘেরা শহর আছে প্রায় একশ, গ্রাম আছে প্রচুর।

পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে লোব্রুলগ্রুড নগরটির বর্ণনা দেওয়া উচিত। একটি নদীর দুই তীরে নগরটি প্রায় সমান দুই অংশে বিভক্ত। নগরে বাড়ি আছে আশি হাজারের উপর। দৈর্ঘ্যে নগরটি তিন গ্লংলু (অর্থাৎ ইংরেজি হিসেবে চুয়ান্ন মাইল) আর প্রস্থে আড়াই গ্লংলু। রাজার আদেশে নগরের রাজকীয় মানচিত্রটি মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং স্কেল অনুসারে আমি নিজে সেই একশ ফুট ম্যাপের উপর খালি পায়ে হেঁটে ম্যাপ যাচিয়ে দেখেছি।

রাজপ্রাসাদটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাড়ি নয়, সাত মাইল ব্যাপী অনেকগুলো বাড়ির সমষ্টি। প্রধান ঘরগুলো সাধারণত দু'শ চল্লিশ ফুট উঁচু এবং ঘরের মেঝের মাপও সেই অনুপাতে লম্বা ও চওড়া। গ্লামডালক্লিচ ও আমাকে একটি ঘোড়ার গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। গ্লামের গভরনেস সেই গাড়িতে করে গ্লাম ও আমাকে প্রায়ই শহর দেখাতে বেরোত, গ্লাম কিছু কেনার জন্যে কোনো দোকানেও ঢুকত। আমি আমার ঘর-বাক্স সমেত ওদের সঙ্গী

হতাম। আমার অনুরোধে গ্লাম আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসত যাতে আমি শহরের বাড়ি ঘর, লোকজন ভালো করে দেখতে পাই। আমাদের গাড়িটি ওয়েস্ট মিনিস্টার হলের মাপ মতো হবে তবে চৌকো। অতটা উঁচু হবে না হয়তো, ঠিক বলতে পারছি না। একদিন কয়েকটা দোকানের সামনে গভরনেস গাড়ি থামাতে বলল। সেখানে বসে ছিল একপাল ভিখারি। গাড়ি থামাতে দেখেই তারা গাড়ি ঘিরে ফেলল। ইস্ কী বীভৎস দৃশ। এমন গা গুলোয় ওঠা দৃশ্য কোনো ইউরোপীয় দেখে নি। একটা বুড়ির বুকে ক্যানসার, একেই তো বিরাট ওদের শরীর তায় ফুলে আরো বড় হয়েছে, দগদগে ঘা আর গর্তয় ভর্তি। কয়েকটা গর্তয় আমি হয়তো ঢুকে যাব। একটা লোকের ঘাড়ে বিরাট এক টিউমার, পাঁচ গাঁট উলের সমান হবে। খট্ খট্ করতে করতে একটা ভিখারি এল, তার কাঠের পা এক একটা পা কুড়ি ফুট। ভিখারিদের ছেঁড়া, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত জামা কাপড়ের উপর দিয়ে উকুন চরে বেড়াচ্ছে দেখে গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। আমি আমার খোলা চোখে উকুনের পা ও অন্য অঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাদের দেশে মাইক্রোস্কোপে দেখা উকুনের চেয়ে আরো স্পষ্ট দেখছি। স্পষ্টভাবে এত বড় উকুন আমি এই প্রথম দেখলাম। সঙ্গে যন্ত্রপাতি বা ছুরি থাকলে (দুর্ভাগ্যক্রমে এসবই আমি জাহাজে ফেলে এসেছি) একটা উকুন ধরে ছিরে দেখতাম কিন্তু সব মিলিয়ে চারদিকের দৃশ্য এতই জঘন্য যে পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে।

আমি প্রাসাদে যে বাক্স-ঘরে থাকি সেটা গাড়িতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে অসুবিধেজনক। তাছাড়া ওটা গ্লামডালক্লিচের কোলের রাখার পক্ষে উপযুক্ত নয়। সেজন্যে মহারানি সেই ছুতোর মিস্ত্রিকে দিয়েই ছোটো একটা ঘর বাক্স তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এটা লম্বা ও চওড়া উভয় দিকে বার ফুট আর দশ ফুট উঁচু। বাক্স তৈরি করবার সময় আমিও মিস্ত্রিকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলাম। এ বাক্সটাও ঠিক অন্য বাক্সের মতো তবে ছোটো। তিন দেওয়ালে তিনটে জানালা ছিল তবে দূর পাল্লার ভ্রমণে কোনো দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে জানালায় জাল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেদিকে জানালা ছিল না সেদিকে দুটো মজবুত আলত্রাপ ছিল। আমার যদি ঘোড়ার পিঠে চড়বার ইচ্ছে হত তাহলে আরোহীর কোমল বন্ধনীর সঙ্গে ঐ আলত্রাপ জুড়ে দেওয়া হত। আমি যখন রাজা বা মহারাজার সঙ্গে কোথাও যেতাম বা উদ্যানে বেড়াতে চাইতাম কিংবা কোনো মন্ত্রী বা মহিলার বাড়ি যেতাম এবং সেই সময় গ্লামডালক্লিচকে যদি তখন পাওয়া না যেত তাহলে কোনো বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আমাকে এইভাবে পাঠানো হত। ইতোমধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁরা আমাকে তুচ্ছ মনে না করে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সে অবশ্য আমার গুণ অপেক্ষা তাঁদের সহৃদয়তার জন্যেই, তাঁদের বাড়ি আমি মাঝে মাঝে ঐ বাক্সয় উঠে ঘোড়ায় করে যেতাম অবশ্য ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে।

যখন ঘোড়ার গাড়ি চেপে দূরে কোথাও ভ্রমণে যেতাম তখন গাড়ির ভিতরে ক্লান্তি লাগলে আমি বাইরে যেতে চাইলে কোচোয়ানের পাশে একটি কোমল বালিশের উপর আমার বাক্সটি বসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু কোচোয়ানের বেল্টের সঙ্গে বাক্সটি সবসময় আটকে থাকত যাতে পড়ে না যায়। বাক্সর ভিতরে শোবার জন্যে বিছানা সমেত একটি খাট ছিল, সিলিং থেকে একটি হ্যামকও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে

আঁটা দুটি চেয়ার ছিল যাতে চেয়ার উল্টে আমি পড়ে না যাই। কিন্তু আমি সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্ত তাই গাড়ির ঝাঁকুনি মাঝে মাঝে বেশি হলেও আমাকে কাবু করতে পারত না।

যখন আমার শহর দেখবার ইচ্ছে হত তখন একটা বিশেষ ব্যবস্থা করা হত। আমার জন্যে তখন একটা তাঞ্জাম আনা হত। তাঞ্জামটা বইত চারজন মানুষ, মহারানির ভৃত্যদের উর্দি পরে। সঙ্গে আরো দুজন লোক যেত। সেই তাঞ্জামে গ্লামডালক্লিচ আমার বাক্স-ঘর তার কোলে নিয়ে বসত। শহরের লোকেরা আমার কথা শুনেছিল, তারা আমাকে দেখবার জন্যে তাঞ্জামের চারদিকে ভিড় করত। গ্লামডালক্লিচ আমাকে বাক্স-ঘর থেকে বার করে তার হাতের উপর রাখত যাতে লোকজন আমাকে ভালো ভাবে দেখতে পায়।

শহরের বড় মন্দিরটা আমার দেখার খুব ইচ্ছা। বিশেষ করে মন্দিরের চুড়োয় উঠতে। কারণ ঐ চুড়ো হল শহরের সর্বোচ্চ, সব বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। আমার অনুরোধ রক্ষা করতে আমার নার্স আমাকে নিয়ে মন্দিরের চুড়োয় উঠল। চুড়োয় উঠে আমি নিরাশ হলাম কারণ জমি থেকে এটি মাত্র তিন হাজার ফুট উঁচু যা এদেশের মানুষের তুলনায় খুব একটা উঁচু নয়। এমন কি ইউরোপে এর তুলনায় অনেক উঁচু অট্টালিকা দেখা যায়, উদাহরণ স্বরূপ সলসবেরি স্টিপলের কথা বলা যায়। তবে আমি এদেশের কাছে নানাভাবে কৃতজ্ঞ, এদের ছোটো করতে চাই না। মন্দির চুড়োটা আমার আশানুরূপ উঁচু না হতে পারে কিন্তু এর কারুকার্য ও শিল্পশোভা অতি চমৎকার। মন্দিরটি অত্যন্ত মজবুত। বড় বড় পাথর কেটেএর দেওয়াল গাঁথা হয়েছে। দেওয়ালগুলো একশ ফুট চওড়া। প্রত্যেকটা পাথর চল্লিশ ফুট চৌকো। মন্দিরের গায়ে খাঁজে খাঁজে দেব দেবী অথবা সম্রাটদের মারবেল মূর্তি। বিরাট বিরাট সব মূর্তি, আসল মানুষের চেয়েও বড়। একটা মূর্তি থেকে একটা কড়ে আঙুল ভেঙে মাটিতে পড়ে ছিল, আমি সেটা তুলে মেপে দেখলাম চার ফুট এক ইঞ্চি। গ্লাম সেটা তুলে নিয়ে রুমালে বেঁধে বাড়ি নিয়ে চলল। তার বয়সী মেয়েরা এইসব টুকিটাকি সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখে।

মহারাজার রন্ধনশালাটি দেখবার মতো। বাড়িটার মাথায় একটা গম্বুজ আছে, ছ'শ ফুট উঁচু। বাড়ির তুলনায় উনুন তত বড় নয়, আমাদের সেন্ট পলস গির্জার গম্বুজের মতো হবে। উনুনটা আমি এদিক থেকে ওদিক মেপে দেখলাম, দশ কদম। রন্ধনশালার হাতা, খুন্তি ও অন্যান্য সরঞ্জামের বিবরণ দিলে তো পাঠকেরা বিশ্বাস করবে না, ভাববে সব ভ্রমণকারীর মতো আমি বুঝি বাড়িয়ে বলছি। আমি এইসব বর্ণনা দিতে বিরত থাকলাম কারণে এই বই যদি ব্রবডিংনাগ দেশের ভাষায় অনূদিত হয় তাহলে এদেশের রাজা ও প্রজারা ভাববে আমি বুঝি ওদের ছোটো করে দেখেছি।

মহারাজা তাঁর আস্তাবলে কখনো দু'শ এর বেশি ঘোড়া রাখতেন না। এক একটা ঘোড়া চুয়ান্ন থেকে ষাট ফুট উঁচু। যখন তিনি কোনো শুভদিন বা কোনো উপলক্ষে অন্যত্র যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে পাঁচশ ঘোড়ার এক রক্ষীবাহিনী যেত, সে এক দারুণ দৃশ্য। ব্যাটালিয়াতে তাঁর অশ্বারহী সৈন্যবাহিনী দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই চমৎকার দৃশ্যের আমি অন্যত্র বর্ণনা দেব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[লেখক কয়েকটি দুঃসাহসিক ঘটনার সমস্মুখীন। এক অপরাধীর প্রাণদণ্ড। নৌচালনা বিদ্যায় লেখক তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দেন।]

আমি যদি আমার ক্ষুদ্র দেহের জন্যে কয়েকটি হাস্যস্পদ দুর্ঘটনায় না পড়তাম তাহলে আমি এদেশে আনন্দেই থাকতে পারতাম। কয়েকটি দুর্ঘটনার উল্লেখ করছি। গ্লামডালক্লিচ আমাকে মাঝে মাঝে আমার বাক্স-ঘর সমেত প্রাসাদের বাগানে নিয়ে যেত। কখনো সে আমাকে ঘর থেকে বার করে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াত আবার কখনো আমাকে নিচে নামিয়ে দিত! সেই বেঁটে বামনকে তখনো মহারানি বিদেয় করে দেয় নি। সেই সময় আমি একদিন বাগানে বেড়াচ্ছি, বেঁটেও বেড়াচ্ছে। বাগানে একটা বেঁটে আপেল গাছ ছিল। আমরা বেড়াতে বেড়াতে যখন সেই আপেল গাছের তলায় গেছি তখন আমার কি দুর্বুদ্ধি হল আমি সেই বেঁটে আপেল গাছের সঙ্গে তুলনা করে বেঁটে বামনের প্রতি একটা মন্তব্য করলাম। আর যায় কোথায়! আমি তখন ঠিক সেই আপেল গাছের তলায়। বেঁটে ছুটে গিয়ে গাছটায় এমন নাড়া দিল যে দশ বারটা আপেল ঝুপঝাপ করে পড়ল। এক একটা আপেল আমাদের বিস্টল ব্যারেলের সমান, সেই একটা আপেল দমাস্ করে আমার পিঠে পড়ল আর আমিও পড়লাম মুখ থুবড়ে। তবে সৌভাগ্যক্রমে আর কোথাও আঘাত লাগে নি। এজন্যে বেঁটেকে শাস্তি দেবার কথা উঠতে আমি তাকে ক্ষমা করতে বললাম কারণ আমিই ওকে ক্ষেপিয়েছিলাম।

আর একদিন। আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসতে পারে। গ্লামডালক্লিচ আমাকে বাগানের ছোটো একটি সবুজ মাঠে ছেড়ে দিয়ে তার গভরনেসের সঙ্গে এদিকে ওদিকে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। ওরে বাবা! সে কী শিলা! মস্ত বড়! এক একটা শিলা টেনিশ বলের মতো আঘাত করে আমার গায়ে সজোরে পড়তে লাগল। আমি কোনো রকমে একটা ঝাঁকড়া লেবু গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে আঘাত লেগেছিল তাতে আমি এমনই কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে বাড়ি থেকে দশ দিন বেরোতে পারি নি। আশ্চর্য হবার কিছু নেই সে দেশের প্রাকৃতিক সব কিছু বিরাট। এমন কি আকাশ থেকে ভূপাতিত শিলাগুলোও। ইউরোপে যে শিলা পড়ে তার চেয়ে এখানকার এক একটা শিলা আঠারশ গুণ বড়। কৌতূহলী হয়ে আমি ওখানকার শিলা মেপে দেখেছিলাম।

ঐ বাগানেই আমার আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন আমার ছোট্ট নার্স আমাকে বাগানে এনে রাপদ মনে করে একটা নিভৃত জায়গায় ছেড়ে দিল। এইভাবে আমাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ আমি মাঝে মাঝে করতাম যাতে আমি নিভৃতে আমার সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারি। গ্লাম সেদিন আর বাক্সটা আনে নি, মিছেমিছি বয়ে এনে কী হবে, বাগানে আমাকে বাক্স থেকে বার করে দিত হয় তো, তার চেয়ে হাতে করে নিয়ে যাওয়াই ভালো। আমাকে বাগানের সেই নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে গ্লাম তার গভরনেস ও আরো কয়েকটি মহিলার সঙ্গে বাগানের অন্য এক অংশে চলে গেল। গ্লাম বেশ একটু তফাতেই তখন চলে গেছে। আমি চিৎকার করে

ডাকলেও সে শুনতে পারে না। এমন সময় একজন বড় মালির একটা স্প্যানিয়েল কুকুর কোথা থেকে এসে হঠাৎ বাগানে ঢুকে পড়েছে এবং আমার গন্ধ পেয়ে আমার কাছে সোজা চলে এসেছে। সে আমাকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে দৌড়ে তার মনিবের কাছে গিয়ে আমাকে আস্তে নামিয়ে দিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

সৌভাগ্যক্রমে কুকুরটি শিক্ষিত, সে যদিও তার দাঁত দিয়েই আমাকে তুলে নিয়েছিল তবুও আমার একটুও আঘাত লাগে নি কিংবা আমার পোশাক কোথাও ছেঁড়ে নি যদিও আমি ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলাম। বেচারা মালি আমাকে চিনত এবং আমার প্রতি সে বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। কুকুরের কাণ্ড দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মহারানির কানে উঠলে চাকরি তো যাবেই, সাজাও পেতে হবে। সে আমাকে আস্তে আস্তে হাতে তুলে নিয়ে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করল কিন্তু আমি তখন এতই ভয় পেয়েছি যে মুখ দিয়ে কথা সরছে না। স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট সময় লাগল, তখন সে আমাকে আমার নার্সের কাছে নিয়ে গেল। ইতোমধ্যে আমার নাসও যেখানে আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে ফিরে এসেছে এবং আমাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে ও ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে গেছে। মালিও সেই সময়ে সেখানে পৌঁছল। আমাকে নিয়ে তখন সব শুনে মালিকে খুব বকাবকি করল সে। তবে গ্লাম সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গেল কারণ মহারানির কানে উঠলে সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। আমিও চাই না যে ব্যাপারটা আর কেউ জানুক কারণ এদের তুলনায় ছোটো হলেও আমার মতো একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষকে কুকুর মুখে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেটা আমার পক্ষে লজ্জার কথা।

এই দুর্ঘটনার ফলে গ্লামডালক্লিচ আমাকে একা তো দূরের কথা বাইরের নিয়ে গেলেও আমাকে আমার ঘরের বাইরে বার করত চাইত না বা চোখের আড়াল করত না। আমার এরকমই ভয় ছিল তাই কয়েকটা দুর্ঘটনা তাকে বলি নি। ঘটনাগুলো ঘটেছিল যখন গ্লাম আমাকে ছেড়ে দিত। একদিন আমি একা বাগানে বেড়াচ্ছি এমন সময় আকাশে উড়ন্ত একটা চিল আমাকে ঠিক নজর করেছে আর নজর করা মাত্রই আমার দিকে ছোঁ মেরেছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার ছোরা বার করেছি কিন্তু তা দিয়ে কি বিশাল চিল আটকানো যায়। ও ঠিক ওর নখ দিয়ে আমাকে তুলে নিত কিন্তু কাছেই ছিল একটা লতা গাছের মাচা। আমি তার নিচে আশ্রয় নিয়ে কোনোরকমে নিজের প্রাণ রক্ষা করলাম। আর একবার। ছুঁচো মাটি খুঁড়ে গর্ত করবার সময় মাটি বার করে একটা ঢিবি তৈরি করেছে। ঢিবিটা নতুন, আমি বুঝতে পারি নি। কৌতূহল বশে তার মাথায় উঠতে গেছি কিন্তু নরম মাটির ভিতর ঢুকে গেছি। জামাকাপড় ময়লা হয়ে গেল। কারণ স্বরূপ গ্লামের কাছে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। আর একবার একটা শামুকের খোলার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে পা ভেঙেছিলাম। আমারই দোষ, দেশের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে বাগানে পায়চারি করছিলাম সেই সময়েই দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

আমি যখন বাগানে একা একা বেড়াতাম তখন অনেক ছোটো ছোটো পাখি আমাকে গ্রাহ্য না করে আমার খুব কাছেই নেচে নেচে পোকামাকড় বা অন্য কোনো খাদ্য খুঁজে বেড়াত, আমার অস্তিত্বই তারা স্বীকার করত না। তা এজন্যে আমি আনন্দিত হতাম, না অনুতপ্ত হতাম, তা বলতে পারি না। গ্লাম ব্রেকফাস্ট করতে আমাকে কেক দিয়েছিল, তারই একটা টুকরো আমার হাতে ছিল। একটা থ্রাশ পাখি সেই টুকরোটা ঠোঁটে করে

তুলে নিল, আমাকে একটুও ভয় করল না। পাখিগুলো ধরবার চেষ্টা করলে তারাই আমাকে তেড়ে আসত, হাতে বা আঙুলে ঠুকরে দিত। তাই আমি আর তাদের কাছে যেতাম না, তারাও আমাকে অগ্রাহ্য করে পোকা বা শামুক খুঁজে বেড়াত। কিন্তু একদিন আমি একটা মোটা কাঠ হাতের কাছে পেয়ে সেটা একটা লিনেট পাখিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম। ভাগ্যক্রমে কাঠটা পাখিটাকে আঘাত করল, পাখিটা পড়ে গেল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দুহাত দিয়ে পাখিটার গলা ধরে যেন যুদ্ধে জিতেছি এইভাবে আমার নার্সের কাছে ছুটে গেলাম। আঘাত পেয়ে পাখিটা হতচেতন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আমার গায়ে মুখে ডানার ঝাপটা দিতে লাগল। নখ দিয়ে আঁচড়াবারও চেষ্টা করতে লাগল তখন আমি ওটাকে দূরে ধরে রইলাম। কাছেই একজন ভৃত্য ছিল, সে পাখিটাকে আমার হাত থেকে নিয়ে ঘাড় মটকে মেরে ফেলল। মহারানি আদেশ দিলেন পাখিটা রান্না করে পরদিন আমার ডিনারের সঙ্গে দিতে। আমার যতদূর মনে পড়ছে লিনেট পাখিটা আকারে ইংল্যান্ডের একটা রাজহাঁসের সমান হবে।

রানির সহচরীরা প্রায়ই গ্লামডালক্লিচকে তাদের কক্ষে যেতে বলত এবং আমাকে সঙ্গে নিয়েই যেতে বলত। আমি যেন খেলনার সামগ্রী। আমাকে হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবে। তারা প্রায়ই আমাকে কোলে করে ঘুরে বেড়াত। আমার খুব খারাপ লাগত, বিরক্তি বোধ করতাম। সত্যি কথা বলতে কি তাদের গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোত। এই সকল অভিজাত মহিলাদের এমন অপবাদ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এবং তাদের আমি শ্রদ্ধাও করি কিন্তু আমি ওদের তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও ওরা আমার তুলনায় বিরাট। অতএব ওদের দেহের সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ আমার নাকে তীব্রভাবে আঘাত দেবেই। অথচ এই সকল মহিলাদের দেহের গন্ধ তাদের প্রিয়জনকে পীড়িত করে না, ঠিক যেমন আমাদের দেশে আমরা আমাদের তুল্য ব্যক্তিদের দেহের গন্ধ টের পাই না। তবে এই মহিলারা দেহে যখন সুগন্ধ লাগাতেন তখন বদ গন্ধ দূর হত বটে কিন্তু সেই সুগন্ধও আমার নাকে তীব্র আঘাত করত এবং আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম। আমার মনে পড়ছে লিলিপুটদের দেশে এক গ্রীষ্মের দিনে সবে ব্যায়াম শেষ করেছি সেই সময় আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসেছিল। সে অভিযোগ করল আমার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আমার গায়ের গন্ধের জন্যে আমি দায়ী নই কিন্তু এখানে যেমন এই দৈত্যদের গন্ধ আমার নাকে লাগছে ঠিক তেমনি লিলিপুটদের নাকেও আমার গায়ের গন্ধ আঘাত করেছিল। তবে মহারানির বা আমার নার্স গ্লামডালক্লিচের দেহের গন্ধ আমাকে পীড়িত করে নি বরঞ্চ ইংরেজ মহিলাদের মতোই তাদের দেহ থেকে সুবাসই নির্গত হত।

আমার নার্স যখন আমাকে মহারানির এই সকল সহচরীর কাছে নিয়ে যেত তখন আমার খুব অস্বস্তি হত। বাগানের ঐ পাখিদের মতো ওরা আমাকে ছোটো হলেও মানুষ বলে গ্রাহ্যই করত না। ভাবত আমি বোধহয় দেওয়ালের একটা টিকটিকি বা ওদের পোষা বিড়াল। খেলনা মনে করে ওরা আমাকে তাদের সামনে সব সময় বসিয়ে রাখত। এ আমি সহ্য করতে পারতাম না, তাদের অত্যন্ত কুশ্রী মনে হত। দেহের অসমান জমি, এখানে ওখানে খানা খন্দ, এখানে একটা তিল ওখানে একটা আঁচিলের ঢিবি। কারো হাত পা ভরতি লোমের জঙ্গল। তাছাড়া তাদের পুরো দেহটাও আমি অত কাছ থেকে দেখতে পেতাম না, নাকে শুধু গন্ধটাই আঘাত করত। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল একটি

ষোড়শী তবে শান্ত নয়, হরিণের মতো চঞ্চলা। আমাকে দু আঙুলে টপ করে তুলে নিয়ে তার বুকের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মতো করে বসিয়ে দিত। এ ছাড়া আমাকে নিয়ে কত রকম খেলা করত, আমি তার বিবরণ দিলে পাতা ভরে যাবে, পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এতদূর বিরক্ত হয়েছিলাম যে গ্লামডালক্লিচকে বললাম আমাকে যেন ঐ চঞ্চলা ষোড়শীর কাছে নিয়ে না যায়, কোনো একটা ছুতো করে যেন এড়িয়ে যায়।

আমার নার্সের গভরনেসের ভাইপো একদিন এসে একজন আসামীর প্রাণদণ্ড দেখবার জন্যে ওদের দুজনকে অনুরোধ করল। সেই আসামী ঐ ভাইপোর এক ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তিকে খুন করেছে। গ্লামডালক্লিচ কোমল হৃদয়া, এসব দৃশ্য তার ভালো লাগে না, সহ্য করতে পারে না, তবুও সেই যুবক চাপাচাপি করল। আমি নিজে যদিও এসব দৃশ্য দেখতে অনিচ্ছুক তথাপি আমার কৌতূহল হল, অসাধারণ কিছু দেখার আশায়। নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দেখলাম একটা মাচা বাঁধা হয়েছে, তার ওপরে একটা চেয়ারে আসামীকে বসানো হয়েছে। ঘাতক এসে চল্লিশ ফুট লম্বা একটা তলোয়ার দিয়ে এক কোপে তার মাথাটা কেটে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে কাটা গলা দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরাতে লাগল, ভার্সাইয়ের ফোয়ারা তার কাছে তার মেনে যায়। মঞ্চ থেকে আমি এক মাইল দূরে ছিলাম কিন্তু বিরাট মাথাটা যখন মঞ্চের নিচে আওয়াজ করে পড়ল, আমি চমকে উঠেছিলাম।

মহারানি আমার সমুদ্রযাত্রার গল্প শুনতে ভালোবাসতেন কিন্তু আমি যখন একা বসে নিজের কথা ভাবতাম রানি তখন আমার বিষণ্ণতা দূর করবার জন্যে আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি নৌকো চালাতে, পাল তুলতে, বা দাঁড় টানতে পারি কিনা। তাহলে একটু দাঁড় টানতে পারলে ব্যায়াম করাও হবে, মনটাও ভালো থাকবে। আমি বললাম এসব বিদ্যা আমার জানা আছে। যদিও আমার চাকরি ছিল জাহাজের সার্জন বা ডাক্তাররূপে তবুও আমাকে অনেক সময় জাহাজে নাবিকের কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না এখানে আমার মাপমতো নৌকো কোথায় পাওয়া যাবে? যেখানে এদের ক্ষুদ্রতম নৌকোটি আমাদের একটা বড় যুদ্ধ জাহাজের সমান আর যদিও আমার জন্যে একটা নৌকো জোগাড় হয় তাহলে সে নৌকো আমি চালাব কোথায়? এ দেশের বিশাল নদীতে সে নৌকো টিকবে না। কিন্তু রানি দমে যাবার পাত্রী নন। তিনি বললেন আমি নৌকোর নকশা করে দিলে তার ছুতোর মিস্ত্রি নৌকো বানিয়ে দেবে এবং আমার নৌকো চালাবারও তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। ওঁরা আমাকে খেলনার পুতুল মনে করেছেন। খেলনার পুতুল কথা বলে না কিন্তু আমি কথা বলি তাই মেয়েদের আমাকে নিয়ে এত মাতামাতি। মিস্ত্রি এল। লোকটি বেশ কুশলী। আমার নির্দেশ অনুসারে সে দশ দিনের মধ্যে সব সাজসরঞ্জামসহ সুন্দর একটা নৌকো বানিয়ে দিল যাতে আটজন ইউরোপীয়ান বসতে পারে। নৌকো শেষ হতে রানি এতদূর খুশি হলেন যে তিনি নৌকোটা কোলে নিয়ে রাজাকে দেখাতে ছুটলেন। রাজাও খুশি হয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন পরীক্ষা করবার জন্যে ওকে নৌকোয় বসিয়ে ঐ ছোটো চৌবাচ্চাটায় ভাসিয়ে দাও। কিন্তু সেই চৌবাচ্চাটা এত ছোটো যে আমি দুহাতে দুটো দাঁড় টানবার মতো জায়গা পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মহারানি অন্য একটা পরিকল্পনা আগেই স্থির করে রেখেছিলেন। তিনি মিস্ত্রিকে আদেশ করলেন আমার জন্যে তিনশ ফুট লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা চৌবাচ্চা বানিয়ে দিতে, দেখো কোথাও যেন ফুটো থাকে

না। চৌবাচ্চা শেষ হতে প্রাসাদের বাইরের দিকে একটা বড় ঘরে রাখা হল এবং জল ভর্তি করা হল। ছিদ্র ছিল শুধু একটা, জল ময়লা হয়ে গেলে সেই ছিদ্র দিয়ে জল বার করে ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেওয়া হত। দুজন পরিচারক সহজে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাঠের চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করে দিত। মহারানি ও তাঁর সহচরীদের এবং আমার নিজেরও মনোরঞ্জনের জন্যে আমি সেই চৌবাচ্চায় নৌকো চালাতাম। এত ক্ষুদে মানুষ এমন সুন্দরভাবে নৌকো চালাচ্ছে দেখে রানি ও মহিলারা দারুণ কৌতুক বোধ করতেন। সময় সময় আমি পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে থাকতাম আর মহিলারা তাঁদের পাখা দিয়ে বাতাস দিতেন। মহিলারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তাদের হাত ব্যথা করতে থাকলে বালক ভৃতরা ফুঁ দিত। পাল ফুলে উঠে নৌকো তরতর করে চলত আমি ইচ্ছামতো নৌকো এদিক ওদিক চালাতাম। আমার নৌবিহার শেষ হয়ে গেলে গ্লামডালক্লিচ নৌকোটিকে তুলে জল ঝেড়ে সেটিকে তার ঘরে একটা পেরেক টাঙিয়ে শুকোতে দিত। এই নৌকো চালানোর ব্যাপারে একদিন এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল যে আর একটু হলেই আমি মরে যেতাম। চৌবাচ্চায় নৌকা ভাসানো হয়েছে। গ্লামের গভরনেস আমাকে নৌকোয় বসিয়ে দেবার জন্যে যত্নসহকারে দু আঙুলে আমাকে উঠিয়ে নিলেন আর ঠিক সেই সময়ে আমি তার আঙুল ফসকে পড়ে গেলাম। তার মানে তার আঙুল থেকে চল্লিশ ফুট নিচে। অত নিচে পড়ে গেলে আমার গতর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত কিন্তু আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে গভরনেসের কোমরের বেল্টে কয়েকটা মাথার কাঁটা গোঁজা ছিল, সেই একটা পিনে আমার শার্ট আটকে গেল, আমি শূন্যে ঝুলতে থাকলাম ও প্রাণে বেঁচে গেলাম। গ্লামডালক্লিচ কাছেই ছিল সে ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করল।

আর একদিন আমার একটা ঘটনা ঘটল। একজন ভৃত্যের কাজ ছিল প্রতি তৃতীয় দিনে চৌবাচ্চাটি টাটকা জল দিয়ে ভর্তি করা। সেদিন সে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল তাই তার বালতিতে যে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ ছিল তা সে দেখতে পায় নি। অতএব জলের সঙ্গে ভেক মহারাজ আমার চৌবাচ্চায় আশ্রয় নিল। ব্যাঙটা জলের নিচে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল কিন্তু যেই আমাকে সমেত নৌকো জলে ভাসিয়ে দিল ব্যাঙও অমনি বসবার একটা জায়গা দেখতে পেয়ে নৌকোর উপর উঠে পড়ল। ফলে নৌকো একদিকে ঝুঁকে পড়ল। নৌকো বুজি উলটে যায়, ভারসাম্য বাজায় রাখবার জন্যে আমি নৌকোর অপর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। যাতে না নৌকো উলটে যায়। ব্যাঙ তখন নৌকোর মধ্যে লাফালাফি আরম্ভ করল আর সেই সঙ্গে তার গায়ের ময়লা আমার মুখে ও জামা প্যান্টে লাগিয়ে দিতে লাগল। ব্যাঙ বড় বিশ্রী প্রাণী, দেখল ঘৃণা করে। গ্লামকে বললাম আমি একাই ওর মোকাবিলা করব। আমি একটা দাঁড় নিয়ে ওটাকে পেটাতে আরম্ভ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাটাকে তাড়াতে পারলাম। সে নৌকো থেকে লাফ মেরে নিচে নামল।

সে রাজ্যে আমি সবচেয়ে যে বিপদে পড়েছিলাম তা হল রন্ধনশালার এক কর্মীর একটি পোষা বাঁদরের জন্যে। গ্লামডালক্লিচ আমাকে তার ঘরে বন্ধ করে রেখে কোনো কাজে গেছে বা কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছে। সেদিন বেশ গরম ছিল ঘরের জানালা খোলা ছিল। আমি ছিলাম আমার বড় বাক্স ঘরে, বেশির ভাগ সময়ে সেই ঘরে থাকতাম। আমার ঘরের দরজা জানালাও খোলা ছিল। বড় বাক্স-ঘরের ছোটো ঘরটা বেশি আরামদায়ক, হাত পা বেশ স্বচ্ছন্দে খেলানো যায়। টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে

নানা চিন্তা করছি এমন সময় মনে হল গ্লামের ঘরের জানালায় কিছু একটা লাফিয়ে পড়ল আর সেটা জানালার এদিকে ওদিকে লাফালাফি করছে। আমি ভয় পেলেও চেয়ার থেকে না উঠে সাহস করে জানালার দিকে চেয়ে দেখলাম জানোয়ারটা এদিক থেকে ওপর নিচে লাফালাফি করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার বাক্স-ঘরের সামনে এসে পড়ল। আমার ঘরটা তার পছন্দ হল, বুদ্ধিমান মানুষের ভঙ্গিতে সে আমায় ঘরের দরজা ও জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে লাগল। আমি আমার বাক্স-ঘরের যতদূর পারলাম ভেতর দিকে ঢুকে গেলাম কিন্তু বাঁদরটা তখন সব কটা জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের ভিতরটা নজর করতে লাগল আর আমার ভয়ও তত বাড়তে লাগল। আমার উপস্থিত বুদ্ধি বলল খাটের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে এবং আমি তাও হয়তো পারতাম। কিন্তু বাঁদরটা উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে কিচিমিচি করতে করতে আমাকে ভালো করেই দেখে ফেলল। বিড়াল যেভাবে ইঁদুর ধরে বাঁদরটাও সেইরকম কায়দা করে একটা হাত আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিল। আমি যদিও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বাঁদরটাকে এড়াবার চেষ্টা করছি এবং আমার স্থান পরিবর্তন করছি কিন্তু বাঁদরও তেমনি আমার নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হল। সে আমার কোটের একটা প্রান্ত ধরে ফেলল আর কোট তো ওদের সিল্কের তৈরি অতএব বেশ মজবুত ও মোটা, ছিঁড়ল না। বাঁদর আমার সেই কোট ধলে আমাকে ঘর থেকে টেনে বার করল। ধাই মা যেমন ভাবে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে কোলে নেয় বাঁদরটা আমাকে সেই ভাবে তার ডান দিকের উরুতে তুলে নিল। আমি ইউরোপেও দেখেছি বাঁদর তার বাচ্চাকে এইভাবে কোলে তুলে নেয়। আমি হাত পা নেড়ে নিজেকে মুক্ত করবার যত চেষ্টা করি বাঁদরটা আমাকে ততই চেপে ধরে। আমি বুঝলাম চুপচাপ থাকাই ভালো নইলে আমার হাড়গোড় ভাঙবে। সে তার অপর হাত দিয়ে আমার গায়ে মৃদুভাবে হাত বোলাচ্ছিল, সে আমাকে অপর কোনো বাঁদরের বাচ্চা ভেবে নিয়েছিল। বাঁদরটাকে কেউ গ্লামের ঘরে ঢুকতে দেখেছিল কিন্তু দরজা বন্ধ ছিল তাই তারা ঘরের দরজায় সামনে এসে চেঁচামেচি করছিল বা দরজা খোলবার চেষ্টা করছিল। গোলমাল শুনে বাঁদরটা যে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, আমাকে নিয়ে হুপ্ শব্দ করে লাফিয়ে সেই জানালায় উঠল তারপর জানালা থেকে ছাদে, ছাদ থেকে লাফ মেরে পাশের বাড়ির ছাদে, আমাকে কিন্তু উত্তমরূপে ধরে আছে। আমি শুনতে পেলাম সেই দৃশ্য দেখে অর্থাৎ আমাকে বাঁদর নিয়ে যাচ্ছে দেখে সবাই চিৎকার করে উঠল। বেচারি গ্লাম তো মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। প্রাসাদের এই দিকটায় মহা সোরগোল পড়ে গেল, ভৃত্যেরা মই আনতে ছুটল, নিচে প্রাঙ্গণে কয়েক শত মানুষ জমায়েত হয়েছে। বাঁদরটা আমাকে নিয়ে একটা বাড়ির ছাদের কিনারায় বসে আছে, আমাকে এক হাতে ধরে আছে আর অপর হাত দিয়ে আমাকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করছে। আমি খাব না কিন্তু সে একটা থলি থেকে কী সব খাদ্যবস্তু বার করে আমার মুখে গুঁজে দিচ্ছে। নিচে যারা জমায়েত হয়েছে তাঁরা বাঁদরের রকম-সকম দেখে কৌতুক অনুভব করছে, হাসছে। তাদের দোষ দিতে পারি না, দৃশ্যটা উপভোগ করবার মতো যদিও ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, বুক ঢিব ঢিব করছে। নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে হচ্ছে। বাঁদরটাকে তাড়াবার জন্যে কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিষেধ করা হল কারণ সেই ঢিলের আঘাত আমাকে জখম করতে পারে।

এদিকে ছাদের চারদিকে মই লাগিয়ে মানুষ উঠে পড়েছে। বাঁদর দেখল তাকে এখনি ঘেরাও হতে হবে তখন সে আমাকে ছাদের একটা ঢালির ওপর আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। মাটি থেকে পাঁচশত গজ উপরে বসে আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। এখন অন্য ভয়, হাওয়ায় না আমাকে উড়িয়ে নিচে ফেলে দেয়। হাওয়া না ফেললেও আমি যেভাবে কাঁপছি বা নিচের দিকে চেয়ে আমার মাথা ঘুরছে তার ফলে নিচে পড়ে না যাই। মনের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় সব শক্তিও নিঃশেষ, নড়বার ক্ষমতাটুকুও নেই। শেষ পর্যন্ত আমার নার্সের একটি ছোকরা পরিচারক আমার কাছে এসে আমাকে তার প্যান্টের পকেটে তুলে নিল এবং নিরাপদে নামিয়ে আনল।

এদিকে আর এক বিপদ। বাঁদর আমার মুখে যেসব খাদ্যবস্তু গুঁজে দিয়েছিল আমি গিলতে পারি নি, গলায় আটকে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। গ্লাম আমার অবস্থা বুঝতে পেরে একটা সুচের মাথা দিয়ে কতকগুলো খাদ্যবস্তু বার করতে আমি বমি করে ফেললাম। এবার আমি স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু সেই জঘন্য জীবের আদরের ঠেলায় আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, পাঁজর ও শরীরের অন্য স্থানে বেদনা বোধ করছিলাম। আমি শুয়ে পড়লাম, পনের দিন লাগল বিছানা ছাড়তে সুস্থ হতে। মহারাজা, মহারানি ও রাজদরবারের সভাসদরা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায়ই খোঁজখবর নিতেন। এই সময়ে মহারানি নিজেও কয়েকবার আমার শয্যাপার্শ্বে এসেছিলেন। বাঁদরটাকে মেরে ফেলা হল এবং এই রকম কোনো জানোয়ার রাজপ্রাসাদে আনা বা রাখা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সুস্থ হয়ে উঠে আমি মহারাজাকে তাঁর দয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে গেলাম। তিনি আমাকে সুস্থ দেখে আনন্দিত হলেন এবং ভাগ্রক্রমে আমি যে বিপদ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি সেজন্যে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাঁদরটা যখন আমাকে ধরে নিয়ে গেল তখন আমার মনোভাব কী রকম হয়েছিল, বাঁদরটা আমাকে যা খেতে দিয়েছিল সেটা কী রকম, ছাদের ওপর তাজা হাওয়া কি আমার ক্ষিধে বাড়িয়েছিল? এমন সব মজার মজার প্রশ্ন করতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আমার নিজের দেশে বাঁদর আমাকে আক্রমণ করলে আমি কী করতাম? আমি বললাম ইউরোপে বাঁদর নেই, কেউ হয়তো কৌতূহল বশে এনে পোষে, খাঁচায় বন্ধ করে রাখে আর যদিও বা আমাকে আক্রমণ করত, তারা এত ছোটো যে দশ বারটা বাঁদরের সঙ্গে আমি একাই মোকাবিলা করতে পারতাম। আর এখানকার বিশাল বাঁদরটা যেটা একটা হাতির সমান, যখন আমাকে ধরবার জন্যে আমার ঘরের ভেতর তার হাতটা ঢুকিয়েছিল তখন আমি ভয়ে আমার ছোরার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নইলে ছোরা দিয়ে তার হাতে বার বার খোঁচা দিলে সে হয়তো যত তাড়াতাড়ি হাত ঢুকিয়েছিল তত তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিত। এই কথাগুলো আমি বেশ জোর দিয়েই বলেছিলাম, ভাবটা এমন যেন আমি কারো পরোয়া করি না। কিন্তু আমার সাহসিকতাপূর্ণ এই বক্তৃতা মহারাজা বা তাঁর আমাত্যদের ওপরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না উপরন্তু সকলেই বেশ জোরে হেসে উঠল। আমাত্যগণও এভাবে হেসে ওঠায় আমি ব্যথিত হলাম। মহারাজার সামনে এভাবে হাসা অন্যায়, তাঁকে অসম্মান করা হয়। ইংল্যান্ডে এমন ঘটনা হয় না, এমন কি আমার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা আমার সামনে এভাবে হাসতে সাহস করবে না। ওরা নিশ্চয় ভেবেছিল ক্ষুদে মানুষটা বাঁদরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে খুব বড় বড় কথা বলছে তো! আমিও বোধহয় তাই মনে মনে জ্বালা বোধ করছিলাম।

আমি মহারাজা ও মহারানিকে প্রতিদিন কিছু অসম্ভব গল্প শোনাতাম, গ্লাম বোধহয় আমার দুষ্টুমি বুঝতে পারত কিন্তু সে তো আমাকে খুব ভালোবাসত তাই রানি যদি আমার সেই সব অসম্ভব গল্প শুনে কিছু মনে করেন তাই সে রানিকে বলে রেখেছিল যে তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যে ও কিছু মজা করবার জন্যেই আমি এই সব গল্প বলি। বেচারি গ্লামের শরীর কিছু খারাপ হয়ে পড়েছিল তাই হাওয়া বদলাবার জন্যে তাকে তার গভরনেসের সঙ্গে শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে যা অতিক্রম করতে এক ঘণ্টা সময় লাগে, তেমন একটা জায়গায় পাঠানো হল। একটা মাঠে চলনপথে গাড়ি থামিয়ে ওরা নামল। গ্লামডালক্লিচ আমার বাক্স-ঘর নিচে নামিয়ে দিল। আমি বাক্স থেকে বেরিয়ে এলাম, একটু চলে ফিরে হাত পা ছাড়িয়ে দিতে চাই আর কি? পথে এক জায়গায় গোবর ছিল। ভাবলাম এটা লাফ মেরে ডিঙিয়ে যাওয়া যাক। লাফ মারবার জন্যে আমি দৌড় লাগালাম এবং জায়গা বুঝে লাফ দিলাম কিন্তু হায়! বিচারে ভুল করেছিলাম, লাফ ছোটো হয়ে গিয়েছিল ফলে পড়লাম গোবরের মাঝখানে, আমার হাঁটু ডুবে গেল। কোনোরকমে গোবার থেকে বেরিয়ে এলাম, দুপায়ে গোবর লেগে গিয়েছিল, একজন সহিস তার রুমাল দিয়ে আমার দুই পা মুছিয়ে দিল। যতটা পারল সে পরিষ্কার করে দিল কিন্তু গ্লাম আমাকে আমার বাক্স ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিল এবং প্রাসাদে না ফেরা পর্যন্ত আর বার করল না। প্রাসাদে ফিরে গ্লাম আমার দুর্দশার কাহিনী রানিকে বলতে ভুলল না এবং সেই সহিসও রঙ চড়িয়ে আমার লাফ মারার গল্পটি বলল। অতএব আমাকে নিয়ে সর্বত্র কয়েক দিন ধরে বেশ হাসাহাসি চলল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[মহারাজা ও মহারানিকে খুশি করবার জন্যে লেখকের কয়েকটি কৌশল। তিনি সঙ্গীতে তাঁর পটুতা দেখালেন। মহারাজা ইউরোপের বিষয় জানতে চাইলেন এবং লেখকও তাঁর বিবরণ পেশ করলেন। মহারাজার মন্তব্য।

আমি মহারাজার কাছে সপ্তাহে একবার বা দুবার যেতাম এবং সেই সময়ে প্রায়ই দেখতাম তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন। প্রথম প্রথম দেখেই আমার ভয় করত কারণ ক্ষুরটা ছিল বিরাট, আমাদের সবচেয়ে বড় তলোয়ার অপেক্ষা অনেক চওড়া ও লম্বা। দেশের রীতি অনুসারে মহারাজা সপ্তাহে দুদিন কামাতেন। একদিন পরামানিককে বললাম কামার পর ক্ষুরের গায়ে লেগে থাকা খানিকটা সাবান আমাকে দিতে। আমি সেই সাবান থেকে চল্লিশ পঞ্চাশটা মোটা ও শক্ত দাড়ি বেছে নিলাম। তারপর এক টুকরো কাঠ নিয়ে সেটা চেঁছে ছুলে চিরুনির মাথার মতো করে গ্লামের কাছ থেকে একটা সুচ চেয়ে নিয়ে সেই কাঠে কয়েকটা ছিদ্র করলাম। দাড়িগুলো এবার ছুরির সাহায্যে কেটে তার ভিতর ঢুকিয়ে কাজচলা গোছের একটা চিরুনি বানালাম। আমার নিজের চিরুনিটা অনেক পুরনো ও ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর চুলে ধরছিল না। এদেশে এমন কারিগর থাকা সম্ভব নয় যে আমার জন্যে ছোট্ট একটা চিরুনি বানিয়ে দিতে পারবে।

এই চিরুনি তৈরি করা থেকে আমার মাথায় একটা মতলব এল যার দ্বারা আমি আমার অলস সময়গুলো কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। যে রমণী মহারানির চুল আঁচড়ে দিত তাকে আমি বললাম চুল আচড়াবার সময় যেসব চুল মহারানির মাথা থেকে উঠে আসে সেগুলো আমাকে দিতে। এইভাবে আমি বেশ কিছু চুল জমালাম ও সেগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখলাম। এরপর আমি সেই ছুতোর মিস্ত্রীকে বললাম আমার মাপমতো চেয়ার বানিয়ে দিতে কিন্তু তার বসবার ও পিঠ ঠেস দেবার জায়গা খালি রাখতে। দরকার মতো আমার জন্যে কিছু বানিয়ে দেবার আদেশ সেই ছুতোরকে দেওয়া ছিল। চেয়ারের ফ্রেম বানাবার পর আমি তাকে চেয়ারে জায়গামতো ছিদ্র করে দিতে বললাম। আমি তখন সেই ছিদ্রে মহারানির মাথার চুল ঢুকিয়ে বসবার আসন ও পিঠ ঠেস দেবার জায়গা ভরাট করে ফেললাম। ঠিক যেভাবে ইংল্যান্ডে বেতের চেয়ার তৈরি করা হয় আর কি। এইভাবে কয়েকটা চেয়ার তৈরি হতে আমি সেগুলো মহারানিকে উপহার দিলাম। তিনি খুশি হয়ে চেয়ারগুলো তাঁর আলমারিতে রেখে দিলেন। কেউ এলে রানি চেয়ারগুলো তাদের দেখাতেন, বলতেন দেখত কেমন ক্ষুদে অথচ চমৎকার জিনিস। সকলে তারিফ করত। একদিন মহারানি আমাকে বললেন ঐ চেয়ারে বসতে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হলাম না, বললাম ঐ চেয়ারে বসা অপেক্ষা আমার হাজার বার মৃত্যু ভালো, যে চুল মহারানির মাথার শোভা বৃদ্ধি করত সেই চুলে আমি আমার দেহের পর্শ্চাদ্দেশ রাখতে পারব না। কারিকুরি কাজে আমার দক্ষতা আছে। আমি মহারানির মাথার চুল দিয়ে পাঁচ ফুট লম্বা সুন্দর একটা পার্স বুনে তার ওপর সোনালি সুতো দিয়ে মহারানির নাম লিখে তাঁকে উপহার দিলাম। তিনি খুব তারিফ করলেন কিন্তু সেটি গ্লামডালক্লিচকে দিতে বললেন। আমি তাই সেটি গ্লামকেই দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি পার্সটি ব্যবহার করা যায় না, বরঞ্চ একটি কৌতূহলের বস্তু, ওদেশের ভারী ও বড় মুদ্রা ওতে রাখা চলে না। গ্লাম ওর মধ্যে মেয়েদের প্রিয় দুচারটে ছোটো খেলনা রেখেছিল।

মহারাজা সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং তিনি প্রায়ই ঐকতানের ব্যবস্থা করতেন। সেই সময়ে আমাকেও আমার বাক্স সমেত নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর বসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রগুলোর এত প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হত যে বাজনা ও সুরের পার্থক্য আমি ধরতেই পারতাম না, কানে তালা ধরে যেত। ইংল্যান্ডে পুরো একটি রাজকীয় বাহিনীর সমস্ত ড্রাম ট্রামপেট একসঙ্গে উচ্চগ্রামে বাজালেও এই প্রচণ্ড আওয়াজের কাছে পৌঁছতে পারবে না। অতএব প্রাসাদে যখন ঐক্যতান বাজানো হত আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম না। যতটা সম্ভব দূরে আমার বাক্স রাখতে বলতাম। তারপর আমি আমার ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে পর্দা নামিয়ে দিতাম তবেই আমি সেই সমবেত সঙ্গীত উপভোগ করতে পারতাম, তখন মন্দ লাগত না।

আমি যখন যুবক ছিলাম তখন স্পিনেট নামে তারের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখেছিলাম। এরা এই যন্ত্রকে কী বলে জানি না, আমি ওটাকে স্পিনেটই বলতাম কারণ বাজাবার পদ্ধতিটা একই রকম ছিল। আমি দেখতাম একজন শিক্ষক সপ্তাহে দুদিন এসে গ্লামকে ঐ বাজনাটি বাজাতে শেখাত। আমার ইচ্ছে হল আমি ঐ যন্ত্রে কিছু ইংরেজি সুর মহারাজাকে শোনাই। কিন্তু গ্লামের যন্ত্রটা বাজানো আমার পক্ষে অসম্ভব। গ্লামের স্পিনেট

ষাট ফুট লম্বা, চাবিগুলো এক ফুট তফাতে, আমি দুদিকে দুহাত প্রসারিত করলে পাঁচটার বেশি চাবি আয়ত্তে আনতে পারব না, তাছাড়া চাবিগুলো টিপতে হলে আমাকে ঘুসি মারতে হবে। তার মানে প্রচণ্ড পরিশ্রম অথচ অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে না। তখন আমি এক কাজ করলাম। দুটো বেটন মানে ছোটো লাঠি নিলাম, লাঠির মাথায় বেশ মজবুত করে দুটো কাঠের বল ঢুকিয়ে দিলাম। বল দুটো ইঁদুরের চামড়া দিয়ে বেশ করে মুড়ে দিলাম অর্থাৎ এমন দুটো হাতুড়ি তৈরি করলাম যা দিয়ে স্পিনেটের চাবিতে আঘাত করা যায় অথচ চাবিগুলোর কোনো ক্ষতি হবে না। তারপর চারফুট লম্বা একটা বেঞ্চি তৈরি করিয়ে সেটা স্পিনেটের চাবিগুলোর নিচে রাখা হল। আমি সেই বেঞ্চিতে উঠে এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করে চাবির ওপর হাতুড়ির আঘাত করে যন্ত্রটিতে নাচের সুর তুলে মহারাজার মুখে হাসি ফোটালাম। মহারাজা ও মহারানি উভয়েই আমার সঙ্গীত উপভোগ করলেন কিন্তু আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম হল এবং ষোলটার বেশি চাবিতে আঘাত করতে পারলাম না এবং অন্য শিল্পীদের মতো সব চাবি টিপে ব্যাস বা ট্রেবল সুর ঠিক মতো বার করতে পারি নি। তবুও একটা ক্ষুদে মানুষ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চমৎকার বাজনা বাজাতে পেরেছিল এতে মহারাজা মহারানি ও সমবেত নরনারী আনন্দিত।

মহারাজা কিন্তু রাজার মতো রাজা ছিলেন, সহানুভূতিশীল ও সমঝদার। তিনি গুণের আদর করতেন। তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে পাঠাতেন, এবং বাক্স সমেত আমাকে তাঁর একটি টেবিলের ওপর রাখা হত। তারপর তিনি আমাকে একটা চেয়ার নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলতেন। আমি তাঁর টেবিলের ওপর তিন গজ দূরে বসতাম যাতে তাঁর ঠিক মুখোমুখি বসতে পারি। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর বসে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি অনেক বিষয়ে আলোচনা হত। একদিন আমি সাহস করে মহারাজাকে বললাম, আপনি ইউরোপ ও বাকি জগৎটার ওপর বৃথা ঘৃণা পোষণ করেন, আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি, অতএব অন্য দেশের প্রতি বিরূপ ভাব কেন পোষণ করেন এটা ঠিক বোঝা যায় না। মানুষের আকার অনুসারে তার যুক্তিও যে গ্রাহ্য হবে এমন কথা ঠিক নয় বরঞ্চ আমাদের দেশে আমরা মনে করি মানুষ যত লম্বা হয় তার বিচারশক্তিও সেই অনুপাতে কমতে থাকে। ক্ষুদ্র প্রাণীদের মধ্যে দেখেন মৌমাছি ও পিপীলিকা কী পরিমাণে পরিশ্রমী। মৌচাক তার বাসা তৈরি করতে যে কুশলতার পরিচয় দেয় তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। মহারাজা আপনি হয়তো আমাকে অবুঝ বা দুর্বল ভাবছেন তবুও আমি হয়তো আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি। মহারাজা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন এবং আমার প্রতি তার ধারণার উন্নতি হতে লাগল। ইংরেজরা কী করে তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে সে বিষয়ে তিনি জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যদিও সব রাজা নিজের শাসনব্যবস্থা উত্তম মনে করে থাকে তথাপি ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় কিছু অনুকরণযোগ্য থাকলে তা তিনি গ্রহণ করবেন।

সুজন পাঠক একবার কল্পনা করুন আমি তখন আকাঙ্ক্ষা করছিলাম আমার যদি ডিমস্থেনিস বা সিসেরো-এর মতো বাকশক্তি থাকত তাহলে মহারাজার প্রশংসা শুনে আমি যে গৌরব বোধ করেছিলাম তা আমার স্বদেশের গুণ প্রকাশ করতে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারতাম।

আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আমার দেশ সম্বন্ধে মহারাজাকে বলতে আরম্ভ করলাম।

আমি বললাম আমাদের সাম্রাজ্য দুটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। কিন্তু একই রাজা অধীন তিনটি দেশে সাম্রাজ বিস্তৃত। এ ছাড়া আমেরিকায় আমাদের উপনিবেশ আছে। জমির উর্বরতা ও দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বললাম। তারপর বললাম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংগঠন যার একটি বিশিষ্ট অংশ হল হাউস অফ পিয়ারস, ইংল্যান্ডের প্রাচীন ও অভিজাত পরিবারের সন্তানদের জন্যে এই হাউস সংরক্ষিত। এই হাউসে যারা প্রবেশের অধিকার লাভ করেন তাঁদের সর্বতোভাবে শিক্ষিত করার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তাদের চারুকলা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে হয়, রণকৌশল ও রাজনীতিতে পারঙ্গম হতে হয় যাতে তারা দেশ শাসনের উপযুক্ত হয়ে রাজাকে সুপরামর্শ দিতে পারে। শুধু তাই নয় আমাদের বিচার ব্যবস্থাও অতি উচ্চস্তরের, বিচারকদের সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হতে হয়, তাদের পাণ্ডিত্য ও বিধানবলীতে এমন জ্ঞান থাকা চাই যা হবে তর্কাতীত। পার্লামেন্টের সভ্য ও অমাত্যগুণ এমন হবেন যাঁরা সর্বদা দেশের স্বার্থের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন ও তাঁরা নিজেরা সাহস শৌর্যে কারো অপেক্ষা হীন হবেন না। এইসব গুণাবলী বংশ পরম্পরায় চলে আসছে তাই আমাদের দেশ ন্যায়ে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ফলে এই সকল সদ্‌গুণের জন্যে তাঁরা উপযুক্ত পুরস্কারও পেয়ে থাকেন। ধর্মকেও আমরা উপেক্ষা করি না। জনসাধারণ যাতে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত না হয় সেজন্যে বিশেষ এক সম্প্রদায় আছে যাদের আমরা বিশপ বলি। এই কাজের জন্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপযুক্ত লোককেই বেছে নেন, এমন লোক যারা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন কারণ তারা হবেন আদর্শ মানুষ, জনসাধারণ যাঁদের ধর্মপিতা বলে মেনে নেবেন।

পার্লামেন্টের আর একটি অংশ বা বিধানসভা আছে যাকে আমরা বলি হাউস অফ কমনস। দেশপ্রেম, সততা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য ও সদগুণ বিচার করে হাউস অফ কমনসের সভ্যদের নির্বাচন করেন। আর এই হাউস মিলিত হওয়ার ফলে এবং প্রধান হিসেবে মাথায় সম্রাটকে রেখে শাসন ব্যবস্থা ইংল্যান্ডে প্রচলিত আছে তা হল ইউরোপের সেরা।

এরপর আমি আমার দেশের বিচার ব্যবস্থার কথা তুললাম। আমি বললাম আমাদের বিচারপতিরা প্রবীণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, আইনের ব্যাখ্যা করতে সিদ্ধহস্ত, সম্পত্তি বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধের তারা সুচারুরূপে নিষ্পত্তি বা মীমাংসা করে দেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে তাঁরা সদা সচেতন। তারপর আমি বললাম সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর আমাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থ বণ্টন করা হয়। শুধু বিচার ব্যবস্থা বা অর্থনীতি নয় আমাদের স্থল ও নৌসেনা তাদের সাহস ও শৌর্যের জন্যে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। আমাদের জনসংখ্যা প্রচুর, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী বা কয়েক প্রকার ধর্ম মতাবলম্বী সম্প্রদায় থাকলেও তাদের স্বার্থ রক্ষা করে উদ্ভূত সমস্যারও সমাধান করা হয়। তারপর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের নানা ব্যবস্থা আছে, অন্য দেশের তুলনায় আমরা সেখানেও পিছিয়ে নেই। আমরা সকলেই স্বদেশপ্রেমী, আমাদের কাছে দেশের সম্মান সর্বাগ্রে। মহারাজাকে এসব ব্যাখ্যা করে ইংল্যান্ডের গত একশত বৎসরের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করলাম।

এইসব আলোচনা চলেছিল অন্তত পাঁচদিন একটানা এবং আলোচনা চলত কয়েক ঘণ্টা ধরে। রাজা মনোযোগ দিয়ে ধৈর্যসহকারে শুনতেন। তিনি মাঝে মাঝে কিছু নোট করতেন এবং পরে আমাকে কী প্রশ্ন করবেন তাও লিখে রাখতেন।

এইসব দীর্ঘ আলোচনার বুঝি শেষ নেই। মহারাজা আরো একদিন আমাকে নিয়ে বসলেন। তিনি নানা বিষয়ে যেসব নোট রেখেছিলেন তার মধ্যে কিছু অস্পষ্ট বিষয় ছিল, কিছু ব্যাখ্যা করার অবকাশ ছিল, কিছু তথ্য জানার ছিল, আপত্তিও কিছু ছিল। এইগুলো তিনি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন। যেমন একটা প্রশ্ন করলেন যে অভিজাত পরিবারের যুবকদের দেহমনের বিকাশের জন্যে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাদের শিক্ষা দেবার প্রাথমিক পর্যায়ে কী ও কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি কোনো অভিজাত পরিবার নির্বংশ হয়ে যায় তাহলে বিধান পরিষদে তাদের স্থান কীভাবে পূরণ করা হয়। যাদের লর্ড উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাদের কী বিশেষ কোনো গুণাবলী থাকা প্রয়োজন? কখনো কোনো রাজা বা রাজবংশের কোনো ব্যক্তির মন জয় করবার জন্যে কিংবা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো মহিলাকে বা কোনো প্রধানমন্ত্রীকে বা বিরুদ্ধ দলের নেতাকে কিংবা নিজের দলের সংগঠন মজবুত করতে অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে কি না অর্থাৎ মহারাজা জানতে চাইলেন আমাদের দেশে ঘুষ প্রথা চালু আছে কি না। তারপর তিনি জানতে চাইলেন সকল লর্ড বংশের সন্তান বা স্বয়ং লর্ডগণ দেশের আইন সম্বন্ধে বা সম্পত্তি ও সম্পদের বিলি ব্যবস্থায় কতটা অভিজ্ঞ বা সচেতন। তারা নীচ প্রবৃত্তি, হিংসা, অভয়ে ঘুষ ইত্যাদি দ্বারা কতটা প্রভাবিত। লর্ড বংশের ব্যক্তি ও সন্তানদের সম্বন্ধে তিনি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। এত বিষয়ে প্রশ্ন করলেন এবং এমন খুঁটিয়ে আলোচনা করলেন যে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করার আর কিছু বাকি থাকল না। আমিও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করলাম।

এরপর তিনি সাধারণ বিধায়কদের বিষয়ে প্রশ্ন শুরু করলেন। অর্থাৎ হাউস অফ কমনস-এর যারা নির্বাচিত হয় তাদের বিষয়ে। তাদের নির্বাচিত হওয়ার জন্যে কী যোগ্যতা থাকা দরকার বা কোনো বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয় কি না। কোনো রীতিবিহীন অথচ অর্থশালী প্রার্থী প্রচুর অর্থ ছড়িয়ে ভোটদাতাদের প্রভাবিত করতে পারে কি না এবং এর দ্বারা ভোটদাতাদের জমিদার বা যোগ্য ব্যক্তি প্রার্থী হলেও তাকে পরাজিত করতে পরে কি না। মহারাজা আরো জানতে চাইলেন সঙ্গতিপন্ন না হয়েও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে (যেজন্যে একটা পরিবার হয়তো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে) অথব অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে মানুষ বিধান পরিষদে নির্বাচিত হতে এত ব্যগ্র কেন? কী উদ্দেশ্য? অথচ নির্বাচিত হলে তাদের কোনো বেতন বা পেনসন দেওয়া হয় না মহারাজা মন্তব্য করলেন এই সকল ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রতি সুবিচার করতে পারে না বলে তাঁর বিশ্বাস।

আমি অবশ্য বলেছিলাম সম্মান, মর্যাদা এবং দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার হাউস অফ কমনস-এ নির্বাচিত হয়। তথাপি মহারাজা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তিনি বললেন এসব ব্যক্তি সাধারণত নীতিহীন হয়, তারা কোনো নীতিহীন মন্ত্রীর সহযোগিতা কুকার্য করতে পারে। এছাড়া তিনি আমাকে আমার দেশ ও রীতিনীতি ও প্রথা ইত্যাদি

সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, তার মধ্যে কিছু আপত্তিজনক প্রশ্নও ছিল। যা হোক সে সকল প্রশ্ন অবান্তর বলে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

এবার মহারাজা আমাদের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে পড়লেন। কতকগুলো বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে চাইলেন। আদালতের বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কারণ আমি একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম অতএব আমি মহারাজার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পেরেছিলাম। একটা মামলা চলতে কতদিন লাগে, কী রকম ব্যয় হয়। সুবিচার সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায় কিনা ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমি তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের বুঝি শেষ নেই। কোনো মামলা যদি মিথ্যা অর্থাৎ সাজানো হয় সে ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ভূমিকা কী? রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি কীভাবে হয়? এই ধরনের মামলায় যেসব আইনজীবী পক্ষ সমর্থন করেন তাঁদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কি না? বিচারকদের এক্ষেতে ভূমিকা কী? যদিও ধরে নেওয়া যায় তারা যথেষ্ট জ্ঞানী তথাপি তাঁরা কি প্রভাবিত হন? একই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে তাঁরা কি কখনো স্বতন্ত্র রায় দিয়েছেন? বিচারকরা কি স্বচ্ছল ব্যক্তি? নাকি অভাবী। তাঁরা তাঁদের সুচিন্তিত রায়দানের জন্যে অথবা অন্য কোনো কারণে পুরস্কৃত হন? কর্মত্যাগ করে অথবা অবসর গ্রহণ করে তাঁরা কি কখনো হাউস অফ কমনস-এর সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন?

ইংল্যান্ডের অর্থভাণ্ডার সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করলেন এবং এক সময়ে মন্তব্য করলেন আমার স্মরণশক্তি বেশ দুর্বল কারণ পূর্বে আমি বলেছিলাম যে রাজস্ব বাবদ আমাদের আদায় হয় বছরে পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ আর এখন আমি যে সংখ্যা বলছি তা নাকি আগে যা বলেছি তার দ্বিগুণ কারণ তিনি নোট রেখেছেন। তিনি বলতে চান আমি তাকে যেসব তথ্য সরবরাহ করেছি তা সঠিক হওয়া দরকার কারণ এই সকল তথ্য তাঁর কাজে লাগতে পারে। তিনি লক্ষ করেছেন যে আমি তাঁকে যে হিসেব দিয়েছি তাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি দেখা গেছে। এটা কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ে চলতে পারে কিন্তু একটা রাষ্ট্রের পক্ষে হলে রাষ্ট্র কার কাছে ঋণ নিচ্ছে? এবং ঋণ পরিশোধের অর্থ কোথা থেকে আসছে? আমরা এত যুদ্ধ করি কেন? তাহলে আমরা ভীষণ ঝগড়াটে? নাকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো মোটে ভালো মানুষ নয়? এবং সেনাপতিরা রাজা অপেক্ষা ধনী হয় কী করে? আমরা প্রধানত কী ব্যবসা করি? ব্যবসা থেকে আয় কেমন হয়? দেশের সঙ্গে ব্যবসাগত ও রাজনীতিগত কি বা কী ধরনের চুক্তি বিদ্যমান। দেশ ঘিরে একটা নৌবহর কী কাজ করে? শান্তির সময় বিপুল ব্যয়ে আমরা একটা বিরাট সেনাবাহিনী রাখি শুনে মহারাজা বললেন আমরা যদি আমাদের প্রতিনিধি মারফত নিজেরাই দেশ শাসন করি তাহলে তিনি ভাবতেই পারছেন না আমরা কাদের ভয় করি এবং আমরা কার বিরুদ্ধেই বা যুদ্ধ করব? একজন সাধারণ বক্তি কি নিজে তার সন্তানদের সাহায্যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে পারে না? তাহলে যৎসামান্য বেতন দিয়ে কতকগুলো পাজি লোককে সৈন্য করবার দরকার কী? ওরা তো যে কোনো পরিবারে ঢুকে সকলের গলা কেটে শতগুণ বেশি রোজাগার করতে পারে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলে কতজন মানুষ আছে তার ওপর ভিত্তি করে দেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করাটা তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমাকে

বললেন তুমি অঙ্কে কাঁচা, ওভাবে মানুষ গণনা করা যায় না। তিনি বললেন, তোমাদের দেশে কোনো কোনো দল জনসাধারণকে সমর্থন করে না এমন মতবাদে বিশ্বাসী। সে ক্ষেতে আমি বলি কি এরকম ঠিক নয়, তাদের উচিত তাদের মতবাদ জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া অথবা জানাতে বাধ্য করা। এ চলতে দেওয়া উচিত নয়। একজন লোক নিজের ঘরে বিষ লুকিয়ে রাখবে তা ঠিক নয়।

মহারাজা বললেন, তোমাদের দেশে অভিজাত পরিবারের লোকেরা জুয়ো খেলে চিত্ত বিনোদনের জন্যে। তারা কত বছর বয়স থেকে এই খেলা আরম্ভ করে, আর ছেড়ে দেয় কত বয়সে? এই খেলাটা কি মাত্রা ছাড়িয়ে পারিবারিক অর্থভাণ্ডারে তারতম্য ঘটায় না? চতুর ব্যক্তিরা কি ধনীদের ঠকিয়ে প্রচুর সম্পদ লাভ করে ধনীদের তাদের কাছে ঋণগ্রস্ত করে তোলে না ?

আমি আমাদের দেশের ইতিহাসের যে সব তথ্য তাঁর কাছে পেশ করেছিলাম তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাকে যা বলেছ তা তো শুধু ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, বিদ্রোহ, খুন, পাইকারি হারে হত্যা, বিপ্লব, নির্বাসন বা লোভ, দলাদলি, ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, বাতুলতা, ঘৃণা, হিংসা, কাম, অপকার করবার প্রবৃত্তি এবং উচ্চাশার নামান্তর।

আর একদিন মহারাজ আমি যা বলেছি এবং তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন করেছেন তার আমি যেভাবে উত্তর দিয়েছি তিনি সেসব পর্যালোচনা করে আমাকে হাতে তুলে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে যা বললেন তা আমি কোনোদিন ভুলব না। তিনি আমাকে বললেন আমার ছোট্ট বন্ধু গ্রিলড্রিগ তুমি তোমার স্বদেশের প্রশংসনীয়ভাবে গুণকীর্তন করেছ কিন্তু তোমার বিবৃতি শুনে মনে হয়েছে যে অজ্ঞতা, আলস্য, চরিত্রহীনতা ও আনুষঙ্গিক নির্গুণ না থাকলে তোমাদের দেশে বিধায়ক হওয়া যায় না। চতুর ব্যক্তিরা আইনের অপব্যাখ্যা করে সৎ ব্যক্তিকে ঠকায়। তুমি তোমাদের দেশের প্রচলিত আইন ও বিধান সম্বন্ধে কিছু ভালো কথা বলেছ কিন্তু সেগুলো এমন ভাষায় লেখা যে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় যার ফলে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তোমাদের দেশে ধার্মিক ব্যক্তিরা সৎপথে থেকে আদর্শ জীবন যাপন করার জন্যে, পণ্ডিতেরা তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার জন্যে, সৈনিকরা সাহস ও শৌর্যের জন্যে, বিচারকরা তাঁদের নিষ্ঠার জন্যে, বিধায়করা দেশপ্রেম ও তাঁদের সৎকাজের জন্যে সরকারের কাছে থেকে কতখানি কী উৎসাহ পায় বা তাদের নিজ নিজ বৃত্তিতে উন্নতির জন্যে তারা কী করেন তা তোমার বিবৃতি থেকে আমি জানতে পারি নি। আমাকে সম্বোধন করে মহারাজা বললেন, তুমি তোমার দেশের অনেক বদঅভ্যাস থেকে বেঁচে গেছ। কারণ তুমি তোমার জীবনের অধিকাংশ সময় ভ্রমণ করে কাটিয়েছ। কিন্তু তুমি তোমার দেশ ও জনসাধারণ সম্বন্ধে যা বলেছ তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে তোমার দেশের অধিকাংশ মানুষ অসৎ এবং তারা পাপে ডুবে আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[লেখকের দেশপ্রেম। লেখক মহারাজার কাছে সুবিধাজনক একটা প্রস্তাব পেশ করল কিন্তু মহারাজা তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে মহারাজার অজ্ঞতা। সে দেশ শিক্ষা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের আইন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পার্টি।]

সত্যবাদীতার প্রতি আমার তীব্র আসক্তি না থাকলে আমি আমার কাহিনীর এই অংশ লিখতাম না। আমার দেশের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনে আমি অন্তরে ক্রোধান্বিত হলেও আমাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এই সব মন্তব্য শুনে আমি নিজেও যেমন দুঃখবোধ করেছিলাম আমার পাঠকগণও নিশ্চয় সেইরকম দুঃখবোধ করবেন কিন্তু মহারাজা প্রতিটি বিষয়ে এত কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু, সহৃদয় ও কৃতজ্ঞ যে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি এড়িয়ে গেছি তবে যেগুলোর উত্তর দিয়েছি তাতে আমার দেশকে সর্বদা বড় করেই দেখিয়েছি, কোথাও ছোটো করবার চেষ্টা করি নি। অবশ্যই দেশ বা দেশবাসীর কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, সেগুলো আমি কখনই বড় করে দেখাই নি এবং আমার দেশের যা কিছু ভালো তা আমি সব সময়েই সামনে ধরেছি। যদিও সেই মহান সম্রাট আমার সবকিছু শুনে প্রভাবিত হন নি, তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের ভালো তাঁর কাছে মন্দ মনে হয়েছে।

কিন্তু এই রাজাকে ক্ষমা করা যেতে পারে কারণ তিনি পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিহীন হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছেন। নিজের দেশ ছাড়া অন্য যে কোনো দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং অন্য দেশের কোনো পরিচয়ই তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ফলে তার মনের প্রসারতা না থাকতেই পারে, যে কোনো দেশের সবই দোষ নয়, গুণও আছে। যাঁরা উদার হৃদয় হয় তাঁরা দোষ বর্জন করে গুণ বড় করে দেখেন কিন্তু রাজার অন্য দেশ ও অন্য মানুষ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাই তাঁর মন একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে, অতএব তাঁর এই মনোভাব মেনে না নেওয়াই ভালো।

আমি যা বলেছি তার সমর্থনে কিছু বলব এবং সীমাবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা কী ক্ষতি করতে পারে তাও আমি দেখাব তবে তা হয়তো অনেকে বিশ্বাস করবে না। মহারাজার অনুগ্রহ লাভ করবার আশায় আমি তাঁকে একটি আবিষ্কারের কথা বললাম। যে আবিষ্কার অন্তত 'তিন চারশ' বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁকে বললাম একরকম চূর্ণ আছে যাতে একটা আগুনের ফুলকি পড়লেই সেটি দপ করে জ্বলে উঠবে এবং তখন বাজ পড়ার চেয়েও জোর শব্দ হতে পারে। ঐ চূর্ণ একটি পেতল বল রেখে যদি তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয় তাহলে বলটি সশব্দে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হবে। তবে সবই নির্ভর করবে ফাঁপা নল বা বলের আকারের ওপর। খুব বড় একটা বল এইভাবে নিক্ষেপ করলে একটা পুরো সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পারে, খুব মজবুত দেওয়ালকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারে, হাজার লোক সমেত জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। আর বলের সঙ্গে একটা শেকল লাগিয়ে দিল জাহাজের পাল ও মাস্তুল কেটে দ্বিখণ্ডিত করে মানুষজনকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। আমরা যখন কোনো শহর

অবরোধ করি তখন একটা বড় লৌহবলের ভিতর ঐ চূর্ণ ভর্তি করি এবং নলের ভিতর সেই বল রেখে ঐ চূর্ণে আগুন লাগিয়ে সেই বল অবরুদ্ধ শহরের উপর ফেলি। শহরে সেই বল পড়ে ফেটে যায়, বাড়ি ঘরদোর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, বল ফেটে লোহার যেসব টুকরো তীব্র গতিতে ছিটকে পড়ে তার আঘাতে মানুষের তৎক্ষনাৎ মৃত্যু হয়, শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। আমি মহারাজাকে বললাম কী উপাদান এবং কত ভাগ মিশিয়ে সেই চূর্ণ তৈরি করতে হয় তা আমি জানি। উপাদানগুলোও সহজে পাওয়া যায় এবং ঐ ফাঁপা নল ও বল, আমি মহারাজার মিস্ত্রিদের নির্দেশ দিয়ে তৈরি করিয়ে দিতে পারি। নল ও বল মহারাজার দেশের প্রচলিত মাপ মতোই হবে। এই ধরুন দু'শ ফুট লম্বা আর বিশ বা তিরিশ ফুট ব্যাসের। আর বড় করবার দরকার হবে না। বলও সেই অনুপাতে তৈরি হবে। ঐ ফাঁপা নলের ভেতর উপযুক্ত পরিমাণ চূর্ণ ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে যে কোনো শহরের সবচেয়ে মজবুত দেওয়াল ও বাড়িঘর উড়ে যাবে। কোনো শহর যদি মহারাজার অবাধ্য হয় তাহলে পুরো শহরটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায়। মহারাজা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এবং আমাকে আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছেন তারই প্রতিদানে আমি বিনীতভাবে ও কৃতজ্ঞচিত্তে আমার প্রস্তাব পেশ করলাম।

আমার প্রস্তাব ও ধ্বংসের বিবরণ শুনে ও যন্ত্রের কার্যকারিতা উপলব্ধি করে মহারাজা রীতিমতো অবাক ও ভীত হলেন। আমাদের মতো ক্ষুদ্র একটা পোকা কী করে এমন ভীষণ ও ভয়ঙ্কর একটা ধারণা কল্পনা করতে পারে ভেবে তিনি বিস্মিত! কী সাংঘাতিক! যে মানুষ প্রথম এই রকম মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে সে নিশ্চয় একটা শয়তান। তিনি বললেন চারুকলা, কোনো শিল্প বা কলাকৌশলের আবিষ্কারের প্রতি তিনি আগ্রহী। কিন্তু এমন একটা অস্ত্র প্রয়োগ করা অপেক্ষা তিনি তাঁর অর্ধেক রাজত্ব ত্যাগ করতে রাজি আছেন এবং আমার যদি প্রাণের ভয় থাকে তাহলে আমি যেন এ বিষয়ে দ্বিতীয় বার আর উল্লেখ না করি।

মহারাজার অনেক গুণ, তিনি জ্ঞানী, বিদ্বান, বহুবিষয়ে চর্চা করেন, সুশাসক, অমায়িক, প্রজানুরঞ্জনকারী কিন্তু যেহেতু তিনি একটা সীমাবদ্ধ স্থানে বাস করেন, অন্য জগতের অস্তিত্বই জানেন না, অন্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, নেই কোনো ভাবের আদান প্রদান, সেইজন্যে তিনি সংকীর্ণমনা। নিজের দেশ ছাড়া আর কিছু তিনি জানেন না। ইনি যদি ইউরোপের রাজা হতেন তবে তিনি অন্য মানুষ হয়ে যেতেন, জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়ত, রাজার যে সকল গুণাবলী থাকা দরকার, যার দ্বারা তিনি সুশাসক হতে পারেন, সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারেন, এইসব ক্ষমতা ও গুণ তিনি অর্জন করতে পারতেন। আমি মহারাজাকে ছোটো করতে চাই না। কিন্তু পাঠকদের কাছে তিনি মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। তবুও রাজার একদিকে জ্ঞান যেমন প্রচুর অজ্ঞানতা তেমনি সীমাহীন। রাজা হিসেবে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেন নি, কারণ এ দেশে সে সুযোগ নেই। ইউরোপ হলে ভিন্ন হত। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে মহারাজাকে আমি বলছিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে ইউরোপে প্রচুর বই আছে। এ কথা শুনে তিনি উৎসাহিত হলেন না উপরন্তু আমাদের বিষয়ে তাঁর নিচু ধারণা জন্মাল। রাজার উত্তম কূটনৈতিক হওয়া উচিত। এ কথা মানতেও মহারাজা প্রস্তুত নন। রাষ্ট্রের কোনো গোপনতা রক্ষার দরকার নেই, সবকিছুর তাৎক্ষণিক সমাধান করে ফেলাই ভালো। তার

জন্যে কিছু সাধারণ জ্ঞান, কিছু বুদ্ধি, কিছু উদারতা থাকলেই যথেষ্ট। তবে বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা অব্যশই থাকা দরকার। আর দরকার সাহস। এই সব গুণ থাকলেও উত্তম শাসক হওয়া যায়,এই হল মহারাজার ধারণা। তিনি বলেন যে ব্যক্তি একই জমিতে একবার শস্য ফলাতে পেরেছে সেই ব্যক্তি সেই জমিতে আবার শস্য ফলাতে পারবে। তারাই মানব চরিত্র যথাযথ বুঝতে পারে এজন্যে কোনো রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

মুশকিল হল এই যে এই সব দৈত্য সদৃশ্য মানুষদের শিক্ষানীতি ত্রুটিযুক্ত, ওদের শুধু শেখানো হয় নীতিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য ও গণিত। এই সব বিষয়ে ওদের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। দৈনন্দিন জীবন যাপন করার পক্ষে বিষয়গুলো উপযোগী। ওরা কৃষি ও ফসলের কিছু উন্নতি করেছে, কারিগরী বিদ্যাও কিছু আয়ত্ত করেছে, কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারছে না। শুধু মাত্র এই কয়েকটি বিদ্যা আয়ত্ত করে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। উচ্চ স্তরের কোনো ধ্যানধারণা বা অতিপ্রাকৃত বিষয়েও আমি তাদের আকৃষ্ট করতে পারি নি, বোঝাতে পারি নি যে এসবেরও প্রয়োজন আছে।

ওদের বর্ণমালার সংখ্যা বাইশটি। মজার বিষয় যে ওদের যে কোনো প্রচলিত আইন বাইশটি শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কয়েকটি মাত্র ঐ সংখ্যা অতিক্রম করেছে। আইন অবশ্য সহজ ভাষাতেই লেখা। শব্দ বিন্যাসে কোনো জটিলতা নেই, কিন্তু সেই আইনের অন্যরকম ব্যাখ্যাও যে হতে পারে এ জন্যে ওরা মাথা ঘামায় না। কারণ ওরা বেশি মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। যদিও বা কেউ সাহস করে কোনো আইনের প্রতিবাদ করতে চায় তা সেটি সর্বোচ্চ অপরাধরূপে বিবেচিত হবে। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী মামলায় যে রায় দেওয়া হয়, পরবর্তী কোনো মামলার তার নজির কেউ উল্লেখ করে না। বিচারক মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দেন।

এরা মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার জানে, ছাপাখানা আছে, বই আছে কিন্তু ওদের পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো নয়। মহারাজার পাঠাগার সবচেয়ে বড় কিন্তু বইয়ের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করবে না। বারশ ফুট লম্বা একটি গ্যালারিতে বইগুলো সাজানো আছে। আমি ইচ্ছামতো বই নিয়ে পড়তে পারতাম, সে স্বাধীনতা আমার ছিল। মহারানির কাঠের মিস্ত্রী একটা যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছিল। সেটা রাখা হল গ্লামডালক্লিচের একটা ঘরে। যন্ত্রটা অরেকটা মইর্য়ের মতো, পঁচিশ ফুট উঁচু, পঞ্চাশ ফুট লম্বা, অনেকগুলা ধাপ আছে। যন্ত্রটা একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরানো যেত। যে বই আমি পড়তে চাইতাম সেই বই দেওয়ালে একটা তাকে আটকে রাখা হত আর সেই মই যন্ত্রে উঠে সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছে পড়তে আরম্ভ করতাম। মই-এর উপরের ধাপে একধার থেকে বইয়ের লাইনগুলো পড়তে পড়তে লাইনের শেষে পৌঁছতাম। এইভাবে কয়েকটা লাইন পড়া হলে পরের ধাপে নেমে আসতাম। এরপর বইয়ের এক পাতার সব কটা লাইন পড়তে পড়তে নিচে নেমে আসতাম। তারপর আবার ওপরে উঠে পাতা উলটে পড়তে আরম্ভ করতাম। বইয়ের পাতাগুলো ছিল পিচবোর্ডের মতো মোটা আর এক একটা পাতা আঠার থেকে কুড়ি ফুট লম্বা। পাতা উলটাতে আমাকে দুটো হাতই লাগাতে হত।

আমি ওদের অনেক বই পড়ে ফেললাম। বিশেষ করে ইতিহাস ও নীতিজ্ঞানের বই। এদের লেখার ধরন স্পষ্ট, বা লেখবার তা সোজাসুজি লিখেছে, অবান্তর একটা শব্দ বা

কোনো অলঙ্কার ব্যবহার করে নি। বক্তব্যের মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই ফলে ভাষার কোনো স্বাদ নেই। নীতিজ্ঞানের যেসব বই তার মধ্যে আমি একখানা বই দেখেছিলাম গ্লামের ঘরে। বইখানা গ্লামের গভরনেসের। মহিলার বয়স হয়েছে রীতিমতো গম্ভীর, নিজেও নীতিজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লেখেন। বইখানা মানুষের নানা দুর্বলতা নিয়ে লেখা তবে যেভাবে লেখা তা পুরুষদের আকৃষ্ট করে না। পাঠকদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশি। এদের লেখক নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে কী লেখে আমার তা জানার আগ্রহ হল। পড়ে দেখলাম লেখক ইউরোপীয় নীতিবাগীশ লেখকদের মতোই উপদেশ বিতরণ করেছেন, ব্যাখ্যাগুলাও প্রায় সেই রকম। লেখক বলেছেন মানুষ এক অসহায় জীব, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে না, ঝড় ঝঞ্ঝা, হিংস্র বন্য পশু ইত্যাদি থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। মানুষ পশুর কাছে পরাভূত, কত পশু আছে তারা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। কত পশুর গতি মানুষের চেয়েও বেশি। কারো অধিকতর দূরদৃষ্টিও আছে তারা আবার মানুষ অপেক্ষা পরিশ্রমী। তিনি লিখছেন যে প্রকৃতি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, তার প্রাচুর্য ক্রমশ কমে আসছে, পূর্বে প্রকৃতি অধিকতর প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী মানুষ বা জীবজন্তুর জন্ম দিতে পারত কিন্তু এখন তা পারে না। এটা ভাবা অন্যায় হবে না যে পূর্বে মানুষের আকার বড় ছিল, দৈহিক গঠন আরো মজবুত ছিল। সেকালে প্রকৃতি দৈত্য ও অতিকায় জীবজন্তুর জন্ম দিতে পারত। এই রাজ্যের মাটির নিচে অনেক বিশাল আকারের খুলি বা কঙ্কাল, হাড় ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বর্তমানে মানুষের আকার ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এবং তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের আকৃতি আরো বড় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরো কঠিন হওয়া উচিত ছিল। কারণ বর্তমানে দুর্ঘটনা-ক্রমে একটা টালি খসে পড়ে আমাদের মাথা জখম করে ফেলতে পারে। দুষ্ট ছেলের ঢিলের আঘাতে কাতর হয়ে পড়ি, এমন কি ছোটো নদীতেও আমরা ডুবে যাই। লেখক এইরকম কিছু যুক্ত উপস্থিত করেছেন এবং কীভাবে এইসব বিপদ এড়িয়ে মানুষ জীবন যাপন করতে পারে তার জন্যে কিছু নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতি নিয়ে নীতিজ্ঞান বা বাকবিতণ্ডা আমার তেমন পছন্দ হল না। তাছাড়া এসব তর্কেরও শেষ নেই। আমরা প্রকৃতিকে দেখি উদার দৃষ্টি দিয়ে কিন্তু এদেশের মানুষ দেখে সংকুচিত দৃষ্টিতে।

সামরিক বিভাগ নিয়ে ওদের অনেক গর্ব। মহারাজার আছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পদাতিক সৈন্য এবং বত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। কিন্তু এটাকে ঠিক সামরিক বাহিনী বলা চলে না। কয়েকটি শহরের ব্যবসাদার ও গ্রামের কৃষকদের নিয়ে বাহিনী গঠিত, তাদের সেনাপতি মনোনীতি করা হয় কোনো অভিজাত পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে এবং কারো কোনো বেতন নেই। এরা উত্তম কুচকাওয়াজ করতে পারে এবং শৃঙ্খলা মেনে চলে, শুধু এইজন্যে তাদের উত্তম যোদ্ধা বলা যায় না। ওদিকে প্রত্যেক কৃষক তাদের জমিদারের অধীন এবং ব্যবসাদাররা তাদের শহরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সামরিক বিভাগে সৈন্য ভর্তি করার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম আছে বলে মনে হয় না। শহরের কাছে কুড়ি ফুট চৌকো একটা মাঠে এই লোরব্রুলগ্রুড শহরের ফৌজকে আমি প্রায়ই কুচকাওয়াজ করতে দেখেছি। এই ফৌজে প্রায় পঁচিশ হাজার পদাতিক ও ছয়হাজার অশ্বারাহী সৈন্য আমি দেখে থাকব। সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। কারণ বিরাটাকার

শরীর নিয়ে ওরা যে মাঠে কুচকাওয়াজ করছিল এবং যারা দূরে ছিল তাদের যথাযথ ভাবে গণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। একজন অশ্বারোহী যে ঘোড়াটির উপর বসে আছে সেই ঘোড়াটি প্রায় নব্বই ফুট উঁচু। আমি দেখছি আদেশ পাওয়া মাত্রই এই অশ্বারোহী বাহিনী একসঙ্গে তাদের তলোয়ার সড়াৎ করে বার করে আন্দোলিত করতে লাগল। এমন বিস্ময়কর দৃশ্য চাক্ষুষ না দেখলে কল্পনা করা যায় না। মনে হয় যেন আকাশে বিশ হাজার বিদ্যুৎ একসঙ্গে ঝলসে উঠল।

কৌতূহলের বিষয় যে এ দেশের রাজা যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের যোগাযোগ একেবারেই নেই সে দেশের লোক একটা সৈন্যবাহিনী এবং তাদের সামরিক কুচকাওয়াজের কল্পনা কী করে করতে পারে? এ বিষয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলে ও বই পড়ে আমি কিছু জানতে পেরেছিলাম। এরাও আমাদের মতো সেই ব্যধিতে একদা ভুগেছিল, যে ব্যধির প্রভাবে রাজা চান প্রজাদের বশে রাখতে আর প্রজা চায় রাজাকে সরিয়ে নিজেরা বা নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে নিতে বা দিতে। দেশের তিনটি দল মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলে প্রচলিত আইনের সাহায্যে তাদের দাবিয়ে দেওয়া হয়। শেষ বিদ্রোহ ঘটেছিল বর্তমান মহারাজার দাদার আমলে। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে সেই বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন। তখন থেকে সামরিক বাহিনীকে একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[মহারাজা ও মহারানি সীমান্তের দিকে যাত্রা করলেন। লেখকও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। কী ভাবে তিনি দৈত্যদের দেশ ত্যাগ করলেন তার বিশদ বর্ণনা। লেখক ইংল্যান্ডে ফিরলেন।]

বরাবর আমার একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে এদের হাত থেকে পালাতে পারব এবং কোনো না কোনো সময়ে আমি দেশে ফিরবই ফিরব। তবে কী করেই বা এদের হাত থেকে মুক্তি পাব এবং কী করে দেশে ফিরতে পারব সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কিংবা কোনো পরিকল্পনাও রচনা করতে পারি নি, শুধু একটা বিশ্বাস অথবা ভিতর থেকে কেউ আমাকে প্রেরণা যোগাতো। আমি যে জাহাজ এসেছিলাম সেইটাই প্রথম জাহাজ যা এদেশের সামুদ্রিক এলাকায় ঢুকে পড়েছিল এবং মহারাজা কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন যে যদি কোনো সময়ে ঐ রকম আর একটা জাহাজ এদিকে এসে পড়ে তাহলে সেখানে আটক করে যেন তার সমস্ত নাবিক ও যাত্রীসহ তাকে লোরব্রুলগ্রুডে তুলে আনা হয়। তাঁর ভীষণ ইচ্ছে আমার আকার মতো একটি রমণী যোগাড় করা, যাতে আমি তার সঙ্গে বিয়ে করে এদেশে সন্তান সন্ততির জন্ম দিতে পারি। কী ঘৃণিত প্রস্তাব। আমি এমন একটা বংশ এদেশে প্রতিষ্ঠা করব যারা বংশানুক্রমে পোষা ক্যানারি পাখির মতো খাঁচার মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করবে। এবং নিজে কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিজাত ব্যক্তিরা তাদের কিনে বন্দী করে রাখবে। আমাকে অবশ্য খুবই যত্নে রাখা হয়েছিল, আমি মহান রাজার এবং মহারানির প্রিয়পাত্র ছিলাম।

রাজসভায় সকলের আনন্দের উৎস ছিলাম কিন্তু এইভাবে দাসের মতো জীবন যাপন করা আমি মানুষের মর্যাদা হানির নামান্তর বলেই মনে করি। আমি ইংল্যান্ডে আমার নিজের বাড়িতে যেসব কথা দিয়ে এসেছিলাম সেসব আমি কখনই ভুলতে পারি না। আমি আমার মতোই মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাদের সঙ্গে পথে প্রান্তরে বিচরণ করতে চাই, কেউ আমাকে চলবার সময় ব্যাঙের মতো পায়ে মাড়িয়ে অথবা কুকুর-বান্দার মতো সজোরে লাথি মেরে হত্যা করুক এই চিন্তায় সর্বদা শঙ্কিত থাকতে চাই না। কিন্তু আমি যা আশা করি নি তার চেয়েও আগে এবং সহজে মুক্তি পেয়ে গেলাম। সমস্ত কাহিনী ও ঘটনা আমি যথাসময়েই বলব।

দেখতে দেখতে এদেশে আমার দুবছর কেটে গেল এবং আমি তিন বছরে পড়লাম। মহারাজা ও মহারানি রাজ্যের দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে ভ্রমণে যাবেন। আমি এবং গ্লামডালক্লিচ তাঁদের সঙ্গী হলাম। আমাকে যথারীতি আমার সেই ছোটো বাক্স-ঘরে বসিয়েই নিয়ে যাওয়া হল। এই ঘরের বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি, বার ফুট চওড়া, বেশ আরামদায়ক। ছাদের চার কোণ থেকে সিলকের একটা হ্যামক ঝুলিয়ে দেবার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম। যাতে ভ্রমণের সময় আমি সেই হ্যামকে শুয়ে ঘুমোতে পারি। মিস্ত্রিকে আমি বলেছিলাম ছাদে এক ফুট ব্যাসওয়ালা গোল একটা ফুটো করে দিতে। তাহলে আমি যখন হ্যামকে শুয়ে থাকব তখন ঘরে হাওয়া খেলবে, আমি গরমে কষ্ট পাব না। তবে গর্তটা যেন ঠিক আমার মাথার ওপর না করা হয়, আর সেই ফুটোর নিচে একটা কাঠ এমনভাবে লাগানো থাকে যেটা আমি ইচ্ছামতো ঠেলে ফুটো বন্ধ করতে পারি।

আমাদের যাত্রাপথ শেষ হল, এইবার কিছুদিন বিশ্রাম। আমরা যেখানে থামলাম সেখান থেকে আমাদের বিলিতি হিসেব মতো সমুদ্র আঠার মাইল দূরে। এখানে মহারাজার একটা প্রাসাদ আছে। কাছেই একটা শহর আছে, সে শহরের নাম হল ফ্ল্যানফ্ল্যাসনিক। গ্লাম এবং আমি, আমরা দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সামান্য সর্দি হয়েছিল। কিন্তু বেচারি গ্লাম এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে, সে তার নিজের ঘরেই শুয়ে থাকত। এদিকে আমি সমুদ্র দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সমুদ্র আমার পলায়নের একমাত্র পথ। অবশ্য সে সুযোগ যদি ঘটে যায়! আমার যত না সর্দি হয়েছিল, আমি তার চেয়ে বেশি কাতর হওয়ার ভান করলাম। আমি বললাম সমুদ্রের তাজা হাওয়া পেলে ভালো হয়। আমার আবেদন মঞ্জুর হল, সঙ্গে একজন বালকভৃত্য দেওয়া হল। এই বালক আমার অনুরক্ত ছিল, ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমি শলা পরামর্শও করেছি। গ্লামডালক্লিচের ইচ্ছে নয় আমি যাই। তাই সে বার বার সেই বালককে সতর্ক করে দিতে লাগল। গ্লাম ছল ছল চোখে আমাকে বিদায় দিল, আমি গ্লামের সে মুখ ভুলব না। কে জানে যা ঘটতে যাচ্ছে তা সে আশঙ্কা করেছিল কি না। বালক আমাকে আমার বাক্সে বন্দী করে নিয়ে চলল। সমুদ্রের ধারে যেখানে পাহাড় ও পাথর আছে তা প্রাসাদ থেকে আধঘণ্টার পথ। সমুদ্রের ধারে পৌঁছে বালককে বললাম আমাকে নামিয়ে দিতে। সমুদ্রের ধারে এসে আমি নিজেকে সুস্থ বোধ করলাম না। বালককে বললাম আমি হ্যামকে উঠে একটু ঘুমোব। একটু ঘুমোলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আমি হ্যামকে উঠলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল তাই বালক জানালা বন্ধ করে দিল। আমি ঘুমিয়ে

পড়লাম। কিন্তু ঘুমোবার আগে একটা জানালা দিয়ে দেখেছিলাম ছেলেটা তখন আমার বাক্স যেখানে নামিয়ে দিয়েছিল সেখানে কোনো বিপদের আশঙ্কা না করে পাহাড় ও পাথরের খাঁজে খাঁজে পাখির ডিম খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। বাক্সর মাথায় যে আংটা আছে সেটা ধরে কে যেন হঠাৎ টেনে তুলল। বাক্সটা সহজে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঐ আংটা লাগানো হয়েছিল। আমার মনে হল আমার বাক্সটা আকাশে অনেক উঁচুতে উঠেছে আর সেটা প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথম ধাক্কাতেই আমি হ্যামক থেকে বাক্সর মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলাম, তখন বাক্স খুব দুলছিল কিন্তু তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেল। যত জোরে পারলাম আমি কয়েকবার চিৎকার করলাম কিন্তু বৃথা। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম শুধু আকাশ আর মেঘ। মাথার ওপর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, পাখি বা পাখিরা যেন ডানা ঝটপট করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম কী সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি। নিশ্চয় কোনো ঈগল আমার বাক্স-ঘরের মাথার ওপরে আংটাটি তার ঠোঁট দিয়ে ধরে আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে, এবার পাথরের ওপর আছড়ে ফেলে দেবে, বাক্স ভাঙবে, আমি মরব, ঈগলটা আমার মৃতদেহটা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। দূরে কোথাও পাহাড়ে এই পাখির বাসা, গন্ধ চিনে সে সেখানে যাবে। আমি আর বাক্সর ভেতর কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারব! কে জানে ভাগ্যে কী আছে।

কিছুক্ষণ পরে ডানা ঝটপট ও আওয়াজ যেন খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল। বুঝতে পারলাম আমার বাক্স পড়ে গেল আর তারপরই অনুভব করলাম বাক্সটা কিছুর ওপর ওঠানামা করতে করতে দোল খাচ্ছে। পড়বার আগে বাক্সটা বেশ জোরে দুলে উঠেছিল, ডানা ঝটপটের আওয়াজও বেশ জোরে শুনেছিলাম। আমার মনে হয়, যে ঈগল আমার বাক্স তার ঠোঁটে ধরে উড়ে পালাচ্ছিল তাকে অন্য এক বা একাধিক ঈগল তাড়া করেছিল এবং তখন প্রথম ঈগল বাক্সটা সোজা ফেলে দেয়। পড়বার সময় আতঙ্কে আমি নিশ্বাস বন্ধ করেছিলাম। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা আওয়াজ শুনলাম। সে আওয়াজ নায়েগ্রা জল প্রপাতের চেয়েও জোর। তারপর মিনিট খানেক অন্ধকার। কী ঘটে গেল বুঝতে সময় লাগল। মাথা একটু ঠিক হতে বুঝলাম বাক্সটা ওঠা নামা করছে, জানালা দিয়ে বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। বাক্সটা একেবারে ফাঁকা নয় যে উলটে-পালটে যাবে। ভেতরে কিছু ওজন আছে, আমি আছি এবং কিছু মালপত্তরও আছে। বাক্সটা তখন পাঁচ ফুট মতো জলে ডুবে ভাসতে ভাসতে চলেছে। আমার অনুমান ঠিক। ঈগল যখন আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল তখন দুটো তিনটে ঈগল তাকে তাড়া করেছিল, তখন সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে জলে ফেলে দেয়। বাক্সর নিচে লোহার মজবুত পাত বসানো থাকায় নিচের অংশ ভারী ছিল অতএব সোজা হয়েই পড়েছে এবং জলে পড়ার আঘাতটাও সহ্য করেছে, বাক্সটা ভেঙে যায় নি। বাক্সটা বেশ মজবুত করেই তৈরি, অন্য দরজার মতো এর দরজা খোলার ব্যবস্থা নেই, ওপর থেকে নিচে টেনে নামিয়ে বন্ধ করতে হয়। পড়বার সময় দরজা বন্ধই ছিল, ফাঁক দিয়ে সামান্য জলই ঢুকেছিল। মাথার ওপর হাওয়া চলাচলের যে ফুটোটা ছিল সেটা বন্ধ করে দিলাম।

এখন আমার বারবার গ্লামডালক্লিচের কথা মনে পড়তে লাগল। মাত্র এক ঘণ্টা আগেও তার কাছে ছিলাম, মনে হচ্ছে কতদিন তাকে ছেড়ে আছি। আমি নিজেই এক

দারুণ বিপদে পড়েছি তারই মধ্যে সত্যি কথা বলতে কি বেচারির কথা ভেবে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমাকে আর না দেখতে পেয়ে বেচারি নিজেতো কষ্ট পাবেই উপরন্তু তাকে মহারানির ভর্ৎসনা শুনতে হবে, তিনি হয়তো ওকে তাড়িয়েই দেবেন। আমার মতো কোনো ভ্রমণকারী বোধহয় এমন বিপদে ও দুর্দশায় পড়ে নি। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে বাক্সটা বুঝি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে অথবা হঠাৎ ঝড়ে বা বড় ঢেউয়ের আঘাতে উলটে যাবে। কোনো দিকের কাঠ ফেটে গেলে বা জানালা ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। ভাগ্যিস জানালার কাচের ওপাশে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে লোহার জাল লাগানো আছে এবং সে কাচও বেশ পুরু নইলে এতক্ষণে একটা কিছু হয়ে যেত। কোনো কোনো ছিদ্র থেকে জল চুঁইয়ে ভিতরে ঢুকছিল তবে ভয়ের কিছু নয়। আমি সেই জল বন্ধ করার চেষ্টা করছিলাম। আমি বাক্সর ছাদের ফুটোর ঢাকাটা খুলতে পারছিলাম না, পারলে বাক্সর ছাদে উঠে বসে থাকতাম। ঘরের বন্ধ অবস্থার যন্ত্রণার দায় থেকে মুক্তি পেতাম। বাক্সবন্দী হয়ে দুচার দিন যদি এইভাবেই থাকি তাহলেই বা তার ফল কী হবে? শীতে ও অনাহারে মৃত্যু। এইভাবে ঘণ্টা চারেক কাটল। প্রতি মুহূর্তে বিপদ আশঙ্কা করছি, এই বুঝি সব শেষ হল।

আমি পাঠকদের আগেই বলেছি আমার বাক্সর দুপাশে দুটি লোহার মজবুত হ্যান্ডেল ছিল। ওদিকে কোনো জানালা ছিল না। হ্যান্ডেল দুটো রাখবার উদ্দেশ্য আমি যখন বেড়াতে যেতাম তখন একজন ভৃত্য ঐ দুটো হ্যান্ডেল দুহাতে ধরে ঘোড়সওয়ারের কাছে তুলে দিত আর ঘোড়সওয়ার হ্যান্ডেল দুটোর ভিতর দিয়ে একটা বেল্ট ঢুকিয়ে দিয়ে বেল্টটা নিজের কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকে দিত। আমার মনে অবস্থা যখন এইরকম, প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছি, ঠিক সেই সময় আমার মনে হল বাক্সর হ্যান্ডেল দুটোতে যেন একটা আওয়াজ হল এবং আমার এও মনে হল আমার বাক্সটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দুপাশে ঢেউ কাটছে ঢেউ আছাড় দিচ্ছে অতএব বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে একটু ক্ষীণ আশা জাগল। যদিও বুঝতে পারছি না কী ভাবে আমার আশা ফলবতী হতে পারে। আমি আমার একটা চেয়ারের স্ক্রু খুলে ফেললাম কারণ চেয়ারগুলো ঐ স্ক্রু দিয়ে বাক্সর সঙ্গে আঁটা ছিল। তারপর সেই চেয়ারখানা তুলে এনে ছাদের ফুটোর ঠিক নিচে লাগালাম। এবার চেয়ারে উঠে ঢাকাটা সরিয়ে ফুটোর যত কাছে সম্ভব মুখ নিয়ে গিয়ে খুব জোর চিৎকার করতে লাগলাম—জান বাঁচাও! যত রকম ভাষা আমার জানা আছে সবরকম ভাষায়। আমার সঙ্গে সব সময় যে ছড়ি থাকত তার ডগায় আমার রুমালটা আটকে ফুটো দিয়ে বাইরে বার করে কয়েকবার আন্দোলিত করলাম। যদি কাছে কোনো জাহাজ বা নৌকো থাকে তাহলে তারা বুঝতে পারবে একটা হতভাগা মানুষ বাক্সটার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে।

আমার মনে হল আমার সব চেষ্টাই বিফল হচ্ছে তবুও আমি চেষ্টা করে চলেছি। তবে বাইরে দেখতে না পেলেও আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমার বাক্সটা কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই রকম ঘণ্টাখানেক চলল বা তারও কিছু বেশি হবে তারপর বাক্সটার যেদিকে হ্যান্ডেল আছে এবং যে দিকে জানালা নেই সেই দিকটা হঠাৎ একটা শক্ত কিছুতে ধাক্কা খেল। আমার মনে হল পাথর ধাক্কা লেগেছে। ধাক্কার ফলে আমাকে বাক্সর মধ্যে কয়েকবার গড়গড়ি খেতে হল। আমার বাক্সর ওপর কয়েকটা শব্দ শুনলাম। যেন

একটা আংটার কাছি আমার বাক্সর উপর পড়ল এবং সেই কাছি বুঝি কেউ বাক্সর মাথায় পরাচ্ছে। তারপর কেউ আমার বাক্সটাকে উপর দিয়ে তুলছে, অন্তত ফুট তিনেক তো তুলেছেই। তখন আমি আমার ছাদের ফুটো দিয়ে রুমাল বাঁধা ছড়িটা উপর দিকে তুলে ধরলাম আর সেই সঙ্গে বেশ জোরে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে লাগলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার গলা ভেঙে গেল। যাক তারপরই বাইরে থেকে আমি একটা উত্তর শুনতে পেলাম। বার বার তিন বার। আমার তখন যা আনন্দ হল তা এমন কেউ বুঝবে না যে না, আমার মতো বিপদে পড়েছে। মাথার উপর আওয়াজ শুনছি, ছাদের গর্তর দিকে মুখ করে কেউ ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, ভিতরে কেউ আছ নাকি? কথা বল। আমি উল্লসিত। ইংরেজিতে জবাব দিলাম, আমি ইংরেজ, খুব বিপদে পড়েছিলাম, এমন বিপদে মানুষ পড়ে না, এখন আমাকে এই বন্দী ঘর থেকে উদ্ধার কর। ওপর থেকে উত্তর এল, আর ভয় নেই, তুমি বেঁচে গেছ, তোমার বাক্স এখন একটা জাহাজের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকা হয়েছে, সে এসে বাক্স কেটে তোমাকে বার করবে। আমি বললাম, তার দরকার নেই। তাতে অনেক সময় লাগবে। বাক্সর মাথার আংটা ধরে বাক্সটা জাহাজের উপর টেনে তোল। তারপর ক্যাপটেনের কেবিনের সামনে নিয়ে চল। আমি বুঝি তখন উত্তেজনায় পাগল হয়ে গেছি। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে কথা বলছি। ওরা ভাবল আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি। ওরা হাসতে লাগল অথচ আমি আমারই মতো ইংরেজ এবং আমারই মতো মানুষদের মধ্যে এসে গেছি। তাদের শক্তিও আমার মতো। তবুও ছুতোর মিস্ত্রি এল এবং বাক্সর মাথায় চারফুট চওড়া একটা গর্ত কাটল, তারপর ভেতরে একটা মই নামিয়ে ধিল। আমি সেই মই বেয়ে উপরে উঠলাম। এবং আমাকে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হল। আমি তখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল।

জাহাজের নাবিকেরা অবাক, স্তম্ভিত। আমাকে তারা হাজার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। কিন্তু আমার তখন সে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। নাবিকদের মতো আমিও অবাক ও বিহ্বল। ভাবছি এতগুলো বেঁটে মানুষ এখানে এল কী করে অথচ তারা আমারই মতো মানুষ। আসলে দীর্ঘদিন দৈত্যপুরীতে থাকায় আমার দৃষ্টি তখন পর্যন্ত অভ্যস্ত হয় নি, নিজেকেও তখন দৈত্য মনে হচ্ছে। কিন্তু জাহাজের ক্যাপটেন মিঃ টমাস উইলকক্স একজন সজ্জন ও যোগ্য ব্যক্তি, স্রপশায়ারে তাঁর বাড়ি। তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন আমি বোধহয় জ্ঞান হারাব, তিনি নাবিকদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন। তারপর আমাকে সুস্থ করবার জন্যে বলদায়ক একটি পানীয় (করডিয়াল) পান করতে দিলেন। বললেন ওঁরই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। ঘুমোবার আগে আমি ক্যাপটেনকে বললাম, যে বাক্সটি তাঁরা উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে বেশ কিছু দামি আসবাব আছে। যা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ঐ বাক্সয় আছে চমৎকার একটি হ্যামক, উত্তম বিছানা সমেত একটি খাট, দুটি চেয়ার, একটি টেবিল এবং কাপড়চোপড় রাখবার একটি ক্যাবিনেট। এছাড়া বাক্সর ভেতরের দেওয়াল সিলকের ওয়াড় দেওয়া নরম ও পাতলা গদি দিয়ে আচ্ছাদিত। ক্যাপটেন যদি বাক্সটা তার কেবিনে আনান তাহলে আমি কৃতার্থ হব। আমি তখন বাক্সর দরজা খুলে দেখাতে পারব ভেতরে কী আছে। বাক্স আমি তাঁরই সামনে রেখে খুলব। আমি অবশ্য ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না তাই আমার কথা

বলার ধরন দেখে ক্যাপটেন ভাবলেন আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আমি আবোল তাবোল বকছি। আমাকে বোধহয় সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি তখন বললেন ঠিক আছে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি জাহাজের ডেকে গেলেন এবং আমার বাক্স-ঘরে কয়েকজন লোককে পাঠালেন। কিন্তু মতোমধ্যে নাবিকেরা (আমি পরে জানতে পেরেছিলাম) বাক্স-ঘরের ভেতর থেকে সব কিছু টেনে বার করেছে। দেওয়াল থেকেও তুলোর আস্তরণ খুলে ফেলেছে। নাবিকদের জানা ছিল না টেবিল চেয়ারগুলো স্ক্রু দিয়ে আঁটা তাই সেগুলো টেনে তুলতে গিয়ে তারা সব রীতিমতো জখম করেছে। এমন কি বাক্স থেকে কিছু কাঠ বার করে সেগুলো জাহাজ মেরামতের কাজে লাগিয়েছে। যখন তারা বুঝেছে ভাঙা বাক্সটা নিয়ে আর কিছু করবার নেই তখন সেটা জলে ফেলে দিয়েছে। বাক্সটার সব দিক ভেঙে যাওয়ায় সেটা সহজে জলে ডুবে গেছে। যাহোক এ দৃশ্য আমাকে দেখতে হয় নি। আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গীর এমন দুরবস্থা দেখলে আমার ভীষণ মানসিক কষ্ট হত। যদিও আমি তখন সব কিছু ভুলতে চাই তবুও সেই সময়ে অতীতের অনেক কথাই হয়তো আমার মনে পড়ত।

আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু দৈত্যপুরীর নানা ঘটনা এবং যেসব বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম সেগুলো স্বপ্নে দেখতে দেখতে বার বার আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। যাহোক ঘুম থেকে ওঠার পর নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হল। এখন রাত্রি প্রায় আটটা। ক্যাপটেন তখনি রাতের আহার দিতে বললেন। ভেবেছিলেন আমি অনেকক্ষণ অভুক্ত আছি। তখন তিনি লক্ষ করলেন আমি স্বাভাবিক হয়েছি, দৃষ্টি সহজ হয়েছে, এলোমেলো কথা বলছি না তখন তিনিও নিম্ন কণ্ঠে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, অত্যন্ত ভদ্রভাবে। ঘরে আমরা দুজন ব্যতীত যখন আর কেউ রইলাম না তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। আমি কোথায় গিয়েছিলাম এবং কী ভাবে ঐ বাক্সবন্দী হয়ে জলে ভাসছিলাম। ক্যাপটেন বললেন বেলা বারটা আন্দাজ সময়ে দুপুরে তিনি যখন চোখে দূরবীন লাগিয়ে দূর সমুদ্রের দিকে নজর রাখছিলেন তখন অদ্ভুত বাক্সটা দূরে জলে ভাসতে দেখেন। প্রথমে উনি ভেবেছিলেন ওটি কোনো নৌকোর পাল, তার মানে কাছে কোনো বন্দর আছে। ওদের কিছু বিসকুট কেনার দাকার ছিল। কিন্তু কাছে আসতে তাঁর ভুল ভাঙল। কোনো কোনো নাবিক আবার সেটা দেখে ভয় পেয়েছিল। তারা ক্যাপটেনকে বলল, একটা বাড়ি সাঁতার কাটছে। তাদের বোকামি দেখে তিনি হাসতে থাকেন এবং তখন কয়েকজন নাবিক নিয়ে তিনি নিজেই নৌকোয় ওঠেন, আর তাদের বললেন সঙ্গে মজবুত দাঁড় নিতে। সমুদ্র তখন শান্ত ছিল। আমাকে অর্থাৎ আমার বাক্স-বাড়িটা প্রথমে তিনি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর জানালা ও লোহার জাল লক্ষ করলেন, কিন্তু ভেতরে কিছু দেখা গেল না। তখন বাক্সর দুদিকে দুটো লোহার হ্যান্ডেল দেখতে পেয়ে নাবিকদের বললেন নৌকো তার কাছে নিয়ে যেতে। তারপর নির্দেশ দিলেন একটা হ্যান্ডেলের ভিতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে সিন্দুকটাকে (ক্যাপটেন আমার বাক্স-বাড়িকে সিন্দুক বলতেন) জাহাজের দিকে টেনে আনতে। তাই আনা হল। বাক্সটা জাহাজের কাছে আসতে তিনি এবার বললেন তার মাথার ওপর আংটায় দড়ি লাগিয়ে সেটা টেনে জাহাজের উপর তুলতে। নাবিকেরা পুলি লাগিয়ে তার ভেতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে বাক্সটা টেনে তুলতে লাগল। কিন্তু দু তিন ফুটের বেশি তুলতে পারল না।

ক্যাপটেন বললেন, তারপর ছড়ির ডগায় বাঁধা রুমাল দেখতে পেয়েই তাঁরা বুঝতে পারলেন কোনো দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ঐ বাক্সর মধ্যে আটকে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি অথবা তাঁর কোনো নাবিক আকাশ তখন বিরাট আকারের কোনো পাখি দেখতে পেয়েছিল কি না? অর্থাৎ যখন বাক্সটা সর্বপ্রথম ওদের নজরে পড়েছিল। তিনি ভেবে বললেন, আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন নাবিকদের মধ্যে আমাকে নিয়ে কিছু আলোচনা চলছিল। তখন একজন নাবিক বলেছিল, সে দূর আকাশে উত্তর দিকে তিনটে ঈগল উড়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু সেগুলো আমাদের দেখা ঈগল অপেক্ষা ছোটো কি বড় তা সে বলে নি। না বলতে পারার সম্ভবত কারণ ঈগলগুলো দূরে এবং অনেক উঁচুতে উড়ছিল। আমি ক্যাপটেনকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি তখন কূল থেকে কত দূরে ছিলেন বলে মনে করেন?

তিনি অনেক ভেবে ও কিছু হিসেবনিকেশ করে বললেন তা একশ লিগ হবে। আমি বললাম আপনি বোধহয় ভুল করছেন, আপনি ওর অর্ধেক দূরেও ছিলেন না। কারণ আমি যে দেশ থেকে আসছি এবং ঈগল যখন আমাকে জলে ফেলে দিয়েছে ইতোমধ্যে দু ঘণ্টার বেশি সময় পার হয়েছিল। ক্যাপটেন আবার চিন্তা করতে লাগলেন তারপর বললেন, আশঙ্কায় তোমার মাথা নিশ্চয়ই ঠিক কাজ করছিল না এবং আমার মনে হয় এখনো তা স্বাভাবিক হয় নি। তুমি তোমার কেবিনে গিয়ে আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমি বললাম আপনি ও আপনার লোকজনের সযত্ন পরিচর্যায় আমি বেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়েছি এবং এখন পূর্বের মতোই আমার বুদ্ধি বৃত্তি কাজ করছে।

এবার তিনি গম্ভীর হলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি কোনো গুরুতর অপরাধ করে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি? তোমার অপরাধের জন্যে তোমার দেশের রাজা কি দণ্ডবিধান স্বরূপ তোমাকে সিন্দুকে বন্ধ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? অনেক দেশে এমন শাস্তি বিধান করা হয়। অপরাধীকে জোর করে ছিদ্র নৌকোয় তুলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে কোনো খাবার বা পানীয় জল দেওয়া হয় না।

ক্যাপটেন বললেন, এমন একজন ব্যক্তিকে জাহাজে তুলে তিনি যদিও দুঃখ বোধ করছেন তথাপি তিনি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান না। প্রথমে যে বন্দরে জাহাজ ভিড়বে সেই বন্দরে তিনি আমাকে নামিয়ে দেবেন। তিনি বললেন জাহাজে উঠে আমি নাবিকদের যে সমস্ত অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য কথা বলেছি এবং পরে আমার সিন্দুক বা বাক্স সম্বন্ধে তাঁকেও যা বলেছি তাতেই তার সন্দেহ হয়েছিল। তাছাড়া রাতে আহারের সময় আমার দৃষ্টি ও ব্যবহার লক্ষ করেও তাঁর এইরকম ধারণা হয়েছে।

আমি বললাম তাহলে আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। তারপর আমি ইংল্যান্ড ছাড়ার পর থেকে তিনি আমাকে জাহাজে তোলা পর্যন্ত যা ঘটেছিল সেই কাহিনী তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বললাম। মানুষের যুক্তিবাদী মন সত্য মিথ্যা বুঝতে পারে। জাহাজের ক্যাপটেন যোগ্য ও সৎ এবং তিনি শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি আমার কাহিনী বিশ্বাস করলেন।

আমার কাহিনীর কিছু প্রমাণ দেবার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, আমার ক্যাবিনেটটি এই কেবিনে আনার ব্যবস্থা করতে যার চাবি আমার পকেটেই আছে। নাবিকরা আমার বাক্সর কী দুর্দশা করেছে সে কথা তিনি আমাকে আগেই বলেছিলেন।

ক্যাবিনেট আনা হলে আমি সে দেশে যে সব দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলাম

সেগুলো তাঁকে দেখাতে লাগলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি সেগুলো আমার ছোটো বাক্স-ঘরের ক্যাবিনেটেই রেখেছিলাম। মহারাজার দাড়ি কেটে যে চিরুনি করেছিলাম এবং মহারানির বুড়ো আঙুলের কাটা নখে মহারাজার দাড়ি বসিয়ে যে আরেকটা সব আমি ক্যাপটেনকে দেখালাম। তারপর সুচ ও পিনের সংগ্রহ ছিল যা এক একটা এক ফুট থেকে দেড় ফুট লম্বা। বোলতার চারটে হুল জুড়ে একটা ছোটো যন্ত্র। মহারানি একদিন আমাকে একটা সোনার আংটি উপহার দিয়েছিলেন, হাসতে হাসতে সেটা আবার তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ সেটা তার কড়ে আঙুলের আংটি, তাও দেখালাম। ক্যাপটেন আমার প্রতি যে ভদ্রতা ও সৌজন্যে দেখিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আংটিটা আমি ক্যাপটেনকে উপহার দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি নিতে রাজি হলেন না।

মহারানির একজন সহচরীর পায়ের আঙুলের একটা কড়া আমি কেটেছিলাম, এই যে সেই কড়াটা, দেখেছেন কত বড়। এটা ক্রমশ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি যখন ইংল্যান্ডে পৌছব তখন এটা আরো শক্ত হবে। তখন এটা দিয়ে একটা বাটি বানিয়ে রুপো দিয়ে মুড়ে দেব।

অবশেষে আমি যে ব্রিচেশ পরে আছি সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, তাঁকে বললাম এই ব্রিচেশ ও দেশের ইঁদুরের চামড়ার তৈরি। গ্লামডালক্লিচের একজন ভৃত্যের একটি দাঁত আমার কাছে ছিল। একজন আনাড়ি ডাক্তার তার যন্ত্রণাদায়ক দাঁতটা তুলতে গিয়ে ভালো দাঁত তুলে ফেলেছিল। আমি সেই দাঁত পরিষ্কার করে আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। দাঁতটা এক ফুট লম্বা এবং বেড়ে চার ইঞ্চি। দাঁতটার প্রতি ক্যাপটেন কৌতূহল প্রকাশ করতে থাকায় সেটা আমি তাকে উপহার দিলাম। তিনি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে সেটি নিজের কাছে রাখলেন।

ক্যাপটেন আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং আমাদের উভয়ের সম্পর্ক নিবিড় হল। তিনি আমাকে বললেন যে আমি ইংল্যান্ডে ফিরে আমার এই অভিজ্ঞতা সংবাদপত্র মারফত যেন পৃথিবীকে জানিয়ে দিই। আমি বললাম ভ্রমণের বই প্রচুর আছে, এত বেশি যে আমরা সব বই পড়ে উঠতে পারি না এবং নতুন যে বই লেখা হবে তা অসাধারণ না হলে কেউ পড়বে না। তবে কিছু ভ্রমণকারী বা লেখক এমন কাহিনী লিখেছেন যা তিনি নিজে দেখেন নি বা অতিরঞ্জিত করেছেন। আমি বললাম আমার অভিজ্ঞতার বিষয় নতুন করে কী আর লিখতে পারি? অন্যান্য ভ্রমণকারী মতোই আমিও বিভিন্ন দেশের মানুষজন, গাছপালা, পশুপাখি, রীতিনীতি, অসভ্যদের মূর্তিপূজা, এই সবই তো দেখেছি। এসব বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন। ক্যাপটেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম আপনি যখন বললেন তখন আমি ভেবে দেখব।

ক্যাপটেন আমাকে বললেন, একটা জিনিস ভেবে তিনি অবাক হচ্ছেন যে আমি এত জোরে কথা বলছি কেন? সে দেশের রাজা ও রানি কি কানে কম শুনতেন? আমি বললাম গত দুবছর ধরে জোরে কথা বলে বলে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। রাজা ও তার প্রজাদের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ও শ্রুতিমধুর, তাঁরা আমার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতেন তাই আমি শুনতে পেতাম বেশ ভালোভাবেই। কিন্তু ওদেশে আমি যার সঙ্গে কথা বলতাম আমার মনে হত সে বুঝি কোনো রাস্তার ধারে উঁচু বাড়ির চুড়োয় বসে আছে, তারা এত লম্বা ছিল। আমাকে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে তাঁরা সামনে চেয়ারে বসলে

অথবা আমাকে হাতে করে তুলে না নিলে তাঁরা আমার কথা শুনতে পেতেন না। আরো একটা কথা বলি, সে দেশে সব মানুষ তো বিরাট লম্বা। দু বছর তাদের দেখে দেখে আমার নজরও সেই রকমই হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি যখন বাক্স থেকে বেরিয়ে জাহাজে চারপাশে তাকালাম তখন আপনার নাবিকদের দেখে আমার মনে হচ্ছিল এ কোথায় এলাম! এখানে সব মানুষ তো ক্ষুদ্রকায়! তখন আমার মনে হচ্ছিল এমন বেঁটে মানুষ আমি বুঝি কখনা দেখি নি। ঐ মহারাজার দেশে আমি যখন ছিলাম তখন আমি আয়নায় নিজেকে দেখতে লজ্জা পেতাম কারণ আমার চারদিকে সব বিরাটকার মানুষ। তাদের তুলনায় নিজেকে পিপীলিকা মনে হত।

ক্যাপটেন আমাকে বললেন রাতে আহারের সময় তিনি লক্ষ করেছেন আমি যেন অনেক কিছু অবাক হয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে হাসি দমন করতে পারছি না। তখন ক্যাপটেন মনে করেছিলেন আমার মাথার কোনো গোলামাল আছে। আমি বললাম, আপনি ঠিক বলেছেন, তবে আমার মাথার কোনো গোলামাল হয় নি। আসলে ওদেশে সব কিছু বড় বড় আকারের দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই খাবার টেবিলে ডিশ দেখে মনে হল ওটা বুঝি আমাদের তিন পেন্স রুপোলি মুদ্রার চেয়ে বড় নয়। পর্ক-এর ঠ্যাং বুঝি এক গ্রাসেই খেয়ে নেওয়া যাবে। একটা কাপ বুঝি বাদামের খোলার চেয়ে বড় নয়। এই ভাবে আমি ওদেশের মহারাজাদের প্রাসাদের নানা সামগ্রীর সঙ্গে আমাদের নিজেদের নানা সামগ্রীর তুলনা করে ক্যাপটেনকে বললাম এই আমার অবাক ও হাসবার কারণ। মহারানির কাছে এবং তাঁর সেবায় আমি বেশ আনন্দেই ছিলাম। তিনি অবশ্য আমার ব্যবহারের জন্যে সব কিছুই মাপ মতো তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চারপাশে যা দেখতাম সেগুলার সঙ্গে আমার নিজস্ব সামগ্রীগুলো ও নিজেকে তুলনা করে আমি নিজে নিজেই হাসতাম। কখনো মনে হত ছোটো হওয়াটা বুঝি একটা ত্রুটি।

এতক্ষণে ক্যাপটেন আমার বক্তব্য বুঝলেন এবং মজা করে বললেন আমার চোখ অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু আমার পেট সে তুলনায় ছোটো। কারণ সারাদিন উপবাস করার পর রাত্রে যা খেলাম তা যৎসামান্য। তারপর কৌতুকের সঙ্গে বললেন আমার বাক্সটা ঈগল পাখি ঠোঁটে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ও তারপর সেটা অনেক উঁচু থেকে সে জলে ফেলে দিল, এ দৃশ্য দেখবার জন্যে তিনি সানন্দে একশ পাউন্ড খরচ করতে পারেন। এই বিরল ঘটনা ও দৃশ্য ভবিষ্যৎ বংশের জন্যে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত। তবে তিনি ফেটনের সঙ্গে তুলনা করে যে মন্তব্য করলেন তা আমি ঠিক হজম করতে পারলাম না।

ক্যাপটেন টনকিন থেকে ইংল্যান্ডে ফিরছিলেন। কিন্তু জাহাজ উত্তর-পূর্বদিকে পথভ্রষ্ট হয়ে ৪৪ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও ১৪৩ ডিগ্রি দ্রাঘিমা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। আমি জাহাজে ওঠার দুদিন পরেই ট্রেড-উইন্ডের প্রভাবে এসে আবার সে পথ পেয়ে যায় এবং সেই হাওয়া অনুসরণ করে দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ দিকে গিয়ে নিউ হল্যান্ড বন্দরে নোঙর ফেলে। তারপর নোঙর তুলে পশ্চিম-দক্ষিণের পশ্চিমে এবং পরে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে কম্পাসের কাঁটার দক্ষিণ—দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়ে আমরা কেপ অফ গুড-হোপ বন্দরে পৌছই। এই সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত সফল হয়েছিল। তবে তার বিবরণ দিয়ে পাঠকদের ধৈর্যের পরীক্ষা করতে চাই না। ফেরার পথেও কয়েকটা বন্দরে ক্যাপটেন জাহাজ

ভিড়িয়েছিলেন। তাজা পানীয় জল ও আহার্য দ্রব্যের জন্যে ক্যাপটেন তীরে নৌকো পাঠাতেন কিন্তু আমি জাহাজেই থাকতাম এবং ইংল্যান্ডে ডাউনস না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি আর কোথাও নামি নি। আমি দৈত্যপুরী থেকে পলায়নের পর প্রায় ন'মাস পরে ১৭০৬ সালের ৩রা জুন দেশের বন্দরে পৌঁছলাম। শুল্ক বাবদ আমি আমার মালপত্র জাহাজে ক্যাপটেনের কাছে জমা রাখার প্রস্তাব করলাম। কিন্তু ক্যাপটেন বললেন আমার মাল নামিয়ে নিতে, শুল্ক বাবদ তিনি এক ফার্দিংও নেবেন না। আমরা হৃদ্যভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমি তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালাম তিনি যেন রেডরিফ-এ আমার বাড়িতে আসেন। জাহাজ থেকে নেমে আমি পাঁচ শিলিং দিয়ে একটা বড় ঘোড়া ও পথপ্রদর্শক ভাড়া করলাম। ঐ পাঁচ শিলিং আমি ক্যাপটেনের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুপাশের বাড়ি, গাছ, মানুষ, গরু, ছাগ সব কিছু দেখে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন লিলিপুটদের দেশে বিচরণ করছি। আমি কি আমার সামনের পথিককে মাড়িয়ে ফেলব নাকি? তাই আমি তাদের হেঁকে বলছিলাম সরে যেতে নইলে ওদের হয়তো আমি মাড়িয়েই ফেলব।

অনেক দিন বাড়ি ছাড়া। বাড়ির খবর আগে নেওয়া দরকার। কিন্তু তখনো আমি নিজেকে দৈত্য ভাবছি তাই যখন একজন ভৃত্য দরজা খুলে দিল তখন রাজহাঁস যেমন তার লম্বা ঘাড় বেঁকিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে, পাছে পাথা ঠুকে যায় সেই ভয়ে আমিও মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলাম। আমাকে আলিঙ্গন করার জন্যে আমার স্ত্রী ছুটে এল, আমি তখন হাঁটু মুড়ে প্রায় তাঁর হাঁটুর সমান নিচু হয়েছি। আমার মেয়েও এল আমার আশীর্বাদ নিতে। আমি তো দৈত্যপুরীতে দৈত্যদের মুখ দেখবার জন্যে সর্বদা মাথা তুলে রাখতাম, সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই এই অবস্থায় আমি প্রথমে আমার মেয়েকে দেখতে পাই নি। দৈত্যদের মতো তাকে আমাকে চোখের কাছে নেবার জন্যে তার কোমর ধরে উঁচু করে তুললাম। ঘরে ভৃত্যরা এবং কয়েকজন বন্ধু ছিল। তখন তাদেরও আমি বামন ভাবছি। আমার স্ত্রীকে বললাম তুমি বুঝি খুব হাত টিপে খরচ করেছ, দেখছি না খেয়েই ছিলে, মেয়েটাও রোগা হয়ে গেছে। আমি এমন ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলাম যে জাহাজের ক্যাপটেনের মতো আমার স্ত্রী ও আর সকলেও ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে আমার মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে। ভিন্ন দেশে থেকে আমার স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল, অভ্যাসও পালটে গিয়েছিল।

আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা ক্রমশ আমার অবস্থা বুঝল এবং আমিও ক্রমশ স্বাভাবিক হতে থাকলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বলল তোমার আর সমুদ্রে যাওয়া চলবে না কিন্তু আমার মাথার পোকা যখন নড়ে ওঠে তখন স্ত্রী বাধা দিলে আর কী হবে। পাঠক শিগগির জানতে পারবেন কী ঘটল। তবে এই সঙ্গে শেষ হল আমার সমুদ্র যাত্রার দ্বিতীয় ভাগ।

কিশোর ক্লাসিক

ISBN 984 8322 09 4